২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

বয়েস অনুপাতে আপনার বাচ্চার ওজন কি ঠিক?

ওকি যতটা ঘুম দরকার তা পাচ্ছে?
ওর প্রথম দাঁত বেরোবে কবে?
আমি কি ওকে ওর প্রয়োজন মত যথেষ্ট পুষ্টি দিচ্ছি?
ও কবে স্থির হয়ে বসতে, আর ভর না দিয়ে
দাঁড়াতে পারবে?

আপনার এই সমস্ত প্রশ্ন আর 'নতুন মায়ের' মনে
আরো যত প্রশ্ন জাগে তার উত্তর দেবে
"শিশুর প্রথম বছরের খাতা"য়! এটি হল
আপনার জন্যে, নতুন ফ্যারেক্সের তরফ
থেকে বিনামূল্যের উপহার!

"শিশুর প্রথম বছরের খাতা"য়
ঠাসা আছে—আপনার সাহায্যের
জন্যে বাচ্চার যত্নের নানান উপায়!
এতে আছে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা
২৩টি ফ্যারেক্স রন্ধন পদ্ধতি—
যাতে আপনার বাচ্চার খাওয়ার
সময়টি বাচ্চার এবং আপনার
—দুজনের পক্ষেই দারুণ
আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে!

আজই আপনার কপির
জন্যে লিখুন:

নতুন
দুধযুক্ত
ফ্যারেক্স
শক্ত আহার
স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো

এই কুপনটি এই ঠিকানায় পোস্ট করুন:
গ্ল্যাক্সো ল্যাবরেটরীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, পো. অ. বক্স 19119 (FCM-3) বম্বে 400 025.
Glaxo Laboratories (India) Limited, P.O.Box 19119 **(FCM-3)**, Bombay 400 025.
অনুগ্রহ করে আমাকে এক কপি "শিশুর প্রথম বছরের খাতা" পাঠিয়ে দিন।
এই সঙ্গে পোস্টেজ ও অন্যান্য খরচ বাবদ 1/-টাকার স্ট্যাম্প পাঠালাম।

নাম _____

ঠিকানা _____

_____

_____

CLARION/B/GX/7/244 BEN

আনন্দমেলা

৮ ফাল্গুন ১৩৯১ ▫ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ ▫ ১০ বর্ষ ১৭ সংখ্যা

বিশেষ রচনা
ভিক্টোরিয়ার পরি । কমলেন্দু সরকার ৫
উপন্যাস
সাত বিলিতি হেরে গেল । শেখর বসু ৩৫
গল্প
বুজরুক । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৯
হিপনোটিজম্‌ । অভিজিৎ সেনগুপ্ত ১৪
ঘরের টানে । কুমার গুপ্ত ২৫
বোম্বেটে ভাগনে । মিলন গঙ্গোপাধ্যায় ৫৫
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৭
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৩
কবিতা
মিষ্টিকুটুম । রত্নেশ্বর হাজরা ১৩
লেখাপড়া
অর্থ জানো (মেহমান মহফিল) । দেব-সেনাপতি ৩০
সহজে ইংরেজি (শীতের সকালে হঠাৎ) । প্রসাদ ৩০
বাঁকুড়া জিলা স্কুল । শ্যামলকান্তি দাশ ৫৮
বিজ্ঞানবিচিত্রা
ঢিমে তালে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২২
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ২২
শার্লক হোমসের গল্প
ওষ্ঠবক্র রহস্য । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫১
চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২৮, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬১
খেলাধুলো
সিরিজ জিতল ইংল্যাণ্ড । রাজা গুপ্ত ৬৩
আজহার, এই সিরিজের আবিষ্কার । অশোক রায় ৬৫
বিতর্কিত গোলে হকিতেও হার । নৃপতি চৌধুরী ৬৬
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা ৩২, শব্দসন্ধান ৩২, মজার খেলা ৩৩
হাসিখুশি ৩৩, তোমাদের পাতা ৪৯

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে-বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক । যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা । ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ- অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক । ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে ।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌
১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

নতুন

মাঞ্চীজ্ বিস্কুট

মুঠো-মুঠো, রাশি-রাশি খেয়ে যাও যত খুশী

বেক্‌ম্যান্‌সের মাঞ্চীজ্ বিস্কুট এত
মজাদার ও কুর-কুরে যে —
স্বাদ পেলে একবার, চাইবেন বার বার

Bakeman's
Home Baked Freshness

কেবল বিশেষ কতগুলি সহরে পাওয়া যাচ্ছে। জীরা—চটকদার, মুখরোচক আয়োয়াইন—কুর-কুরে, নোনতা

OBM/9705/BEN

উপরে নীল আকাশ, নীচে ময়দানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে 'বিশ শতকের তাজমহল'

ভিক্টোরিয়ার পরি

কমলেন্দু সরকার

কলকাতায় একসময় ছিল অগণিত পরি। সাবেকি থামওয়ালা বাড়ি থেকে বড়লোকদের বাড়ির আইভিলতায় ঢাকা গেটের মাথায়, আবার মধ্যবিত্তের বাড়িতেও ছাদের দিকে চোখ ফেরালেই দেখা মিলত পরিদলের। সিমেন্টের পরি। কোথাও গেটের ওপর লোহার পরি। কোথাও বা ফোয়ারায় জল-পরি। তারা স্নান করত ফোয়ারায়। কেউ বা পাহারা দিত কেয়ারি-করা বাগানবাড়িতে। আবার অনেক পরি বিশাল দেওয়ালের গায়ে ডানা মেলে বা হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করত।

তাদের ভঙ্গি ছিল নানারকম। আর ছিল রূপকথার পরিরা। পোর্সিলিন আর কাঠের তৈরি পরিরা থাকত আলমারিতে। হয়তো আজও কারও বাড়িতে পাওয়া যাবে তাদের। কিন্তু আকাশ-ছোঁয়া বাড়ির ছাদ, দেওয়াল বা গেটের মাথা থেকে পরিরা ধরতে গেলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এতরকম পরি এল গেল, কিন্তু ব্রোঞ্জের পরি কোথায় ? আছে। ময়দানের দক্ষিণে ওই তো কাজল-কালো মেয়ে। তার ডান হাতে ফুলের তোড়া। বাঁ হাতে ধরা লম্বা এক বাঁশি। সে যেন বাঁশি বাজিয়ে কলকাতাবাসীদের কাছে কোনও বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে। পিঠের দুই বিশাল ডানা মেলে দেওয়া। দেখলেই চমক জাগে ! মনে হয়, দুধ-সাদা পাথরের স্মৃতিসৌধে তার সুন্দর চেহারায় এসেছে গতির দোলা।

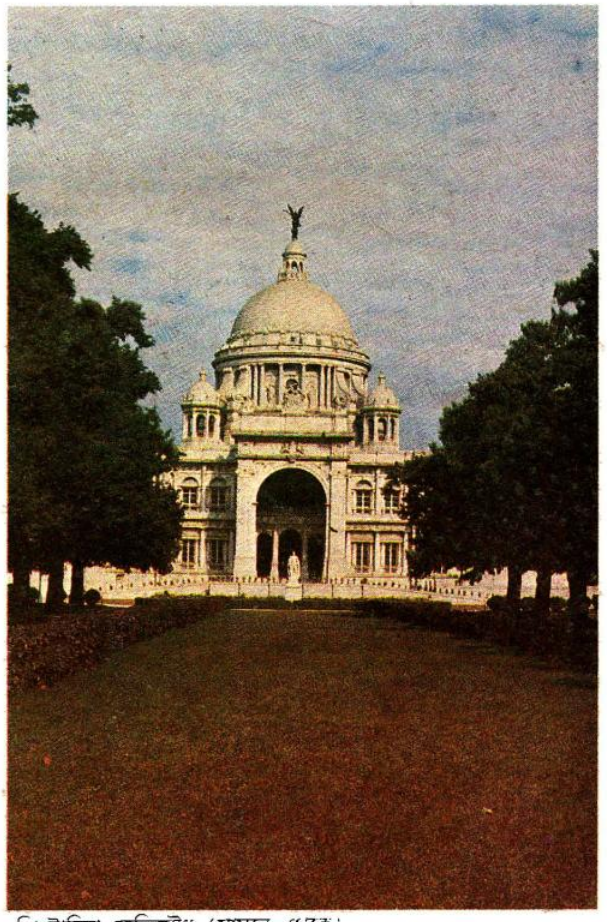

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ (সামনে থেকে)

প্রকৃতিই আপনার ত্বকের শত্রু!

ত্বকের সুরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক উপাদান ও প্রকৃতিদত্ত উপায়ই সবচেয়ে ভাল...

বোরোক্যালেনডুলা-ই একমাত্র অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম যাতে আছে প্রাকৃতিক উপাদান—ক্যালেনডুলা ও হাইড্রাসটিস ভেষজের নির্য্যাস। যা সব সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

বোরো ক্যালেনড়ুলা অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম মাখুন, আপনার ত্বক স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখুন।

বোরো ক্যালেনড়ুলা*

অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম

* A PATENT & PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE, OF HAHNEMANN LABORATORY, CALCUTTA - 12

anjan chakraborty, Cal-74

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ১৮৪ ফুট উঁচু গম্বুজের মাথায় আছে এই পরি। এর পোশাকি নাম এঞ্জেল অব ভিক্ট্রি। বয়স খুব একটা কম নয়—চৌষট্টি। তবে পরিদের তো আর বয়স বাড়ে না, তাই চেহারায় বয়েসের কোনও ছাপ পড়েনি।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ১৯০৬ সালের ৬ জানুয়ারি। কলকাতা ময়দানের দক্ষিণ প্রান্তে ১৯০ বিঘে জমির ওপর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন রানি ভিক্টোরিয়ার পৌত্র যুবরাজ জর্জ। পরবর্তীকালে যিনি পরিচিত হন পঞ্চম জর্জ নামে।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধটি তৈরির প্রস্তাব ছিল লর্ড কার্জনের। ১৯০১ সালে রানির মৃত্যুর পরে বিষয়টি তাঁর মাথায় আসে। লর্ড কার্জনের আবেদনে সাড়া দেন ভারতের রাজন্যবর্গ, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা। সাড়া দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষরাও। তাঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। আর সৌধ তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ৭৬ লক্ষ টাকা।

রানির এই স্মৃতিসৌধের নক্শা তৈরি করার ভার পান ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অব আরকিটেক্টের সভাপতি স্যার উইলিয়াম এমার্সন। মার্টিন কোম্পানি বাড়ি নির্মাণের দায়িত্ব পায়। কিন্তু কলকাতার আবহাওয়ার কথা ভেবে নক্শার কিছুটা পরিবর্তন করেন ওই কোম্পানিরই অন্যতম ইঞ্জিনিয়ার স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি। এমার্সন সাহেবের ওই নক্শা ছিল ইতালীয় রেনেশাঁসি স্থাপত্য-ঢঙে তাজমহলের অনুকরণে। তাই বোধহয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের আর-এক নাম 'বিশ শতকের তাজমহল'।

শ্বেতপাথরের তৈরি এই স্মৃতিসৌধের সমস্ত পাথরই এসেছিল রাজস্থানের নাগৌরের মাক্রানা থেকে। আর বাড়ি সাজানোর জন্য মূর্তিগুলো তৈরি হয়েছে ইতালীয় শ্বেতপাথরে। সাধারণের প্রবেশের জন্যে বাড়ির দরজা খুললেন রানি ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্র যুবরাজ এডওয়ার্ড (পরে যিনি হন অষ্টম এডওয়ার্ড)। সেই দিনটি ছিল বুধবার, ১৯২১ সনের ২৮ ডিসেম্বর।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের অন্দরমহলে এক-এক ঘরে এক-এক ধরনের জগৎ,মূল গম্বুজের দেওয়ালের গায়ে আঁটা আছে মহারানির জীবনের বিভিন্ন সময়ের ঘটনাবলী। ভীষণ সুন্দর সেগুলি। আর আছে পুরনো কলকাতার স্মৃতি। আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতার নথিপত্র। দলিল-দস্তাবেজ। স্মারকচিহ্ন। ছবিতে কলকাতা। সেকালের কলকাতাবাসী বহু ইউরোপীয় শিল্পীর আঁকা ছবিও আছে এখানে—জন জোফানি, টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল, হিকি, সলভিন্স। আছেন আরও অনেকে। দেখে মজা লাগে—তখনকার কলকাতার পথঘাট, দোকানপাট, দুর্গাপুজো কিংবা হারিয়ে যাওয়া কলকাতার গ্রামের চেহারা-চরিত্র। কোনও ঘরে আছে ইংরেজ আর নবাবদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র। আছে মুরশিদ কুলি খাঁর তলোয়ার। আছে ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র। বড়-বড় রাজা-মহারাজার দুষ্প্রাপ্য প্রতিকৃতি। ভারতের বহু বিখ্যাত মানুষের তৈলচিত্র। প্রাচীন মুদ্রা। আরও কত কী! আকর্ষণ করে রানি ভিক্টোরিয়ার বিশাল ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি। আর বিখ্যাত রুশ শিল্পী ভেরেশ্চেগিনের ১৮৭৬ সনে আঁকা 'জয়পুরে প্রিন্স অব ওয়েলস' (সপ্তম এডওয়ার্ড)।

ইতালিতে যখন তৈরি হচ্ছিল ভিক্টোরিয়ার পরি

এটি নাকি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম আঁকা ছবি।

বিশ শতকের এই তাজমহলটি অসামান্য। অপরূপা পরিটিও। ইতালির এক ভাস্করের তৈরি কাজল-কালো এই পরিটি উচ্চতায় প্রায় পাঁচ মিটার। ওজন সাড়ে তিন হাজার কিলোগ্রাম। একদিন গতি ছিল তার। ঘুরে দেখত চারদিক। সে একটা বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুরে-ফিরে দোলা খেত চারপাশে। চোখ ঘোরাত উৎসুক নগরবাসীর দিকে। কিন্তু এখন কলকাতার বুকে কাঁপন দিয়ে মস্ত ঝড় বইলেও সে আর ঘোরে না। ডানে কিংবা বাঁয়ে—কোনো দিকেই নয়। চৌষট্টি বছরের পরিটি এখন স্থাণু।

কিন্তু এই পরিটি আবার ঘুরবে। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের ডিরেক্টর ডঃ হীরেন চক্রবর্তী জানালেন, তারই চেষ্টা চলছে এখন। হাওয়ার সঙ্গে ঘুরছে ভিক্টোরিয়ার পরি, এই দৃশ্য আবার তোমরা দেখতে পাবে।

ফোটো : সুজিত ঘোষ

আহা, কী অপরূপ রূপ পিয়ার্স-এর!

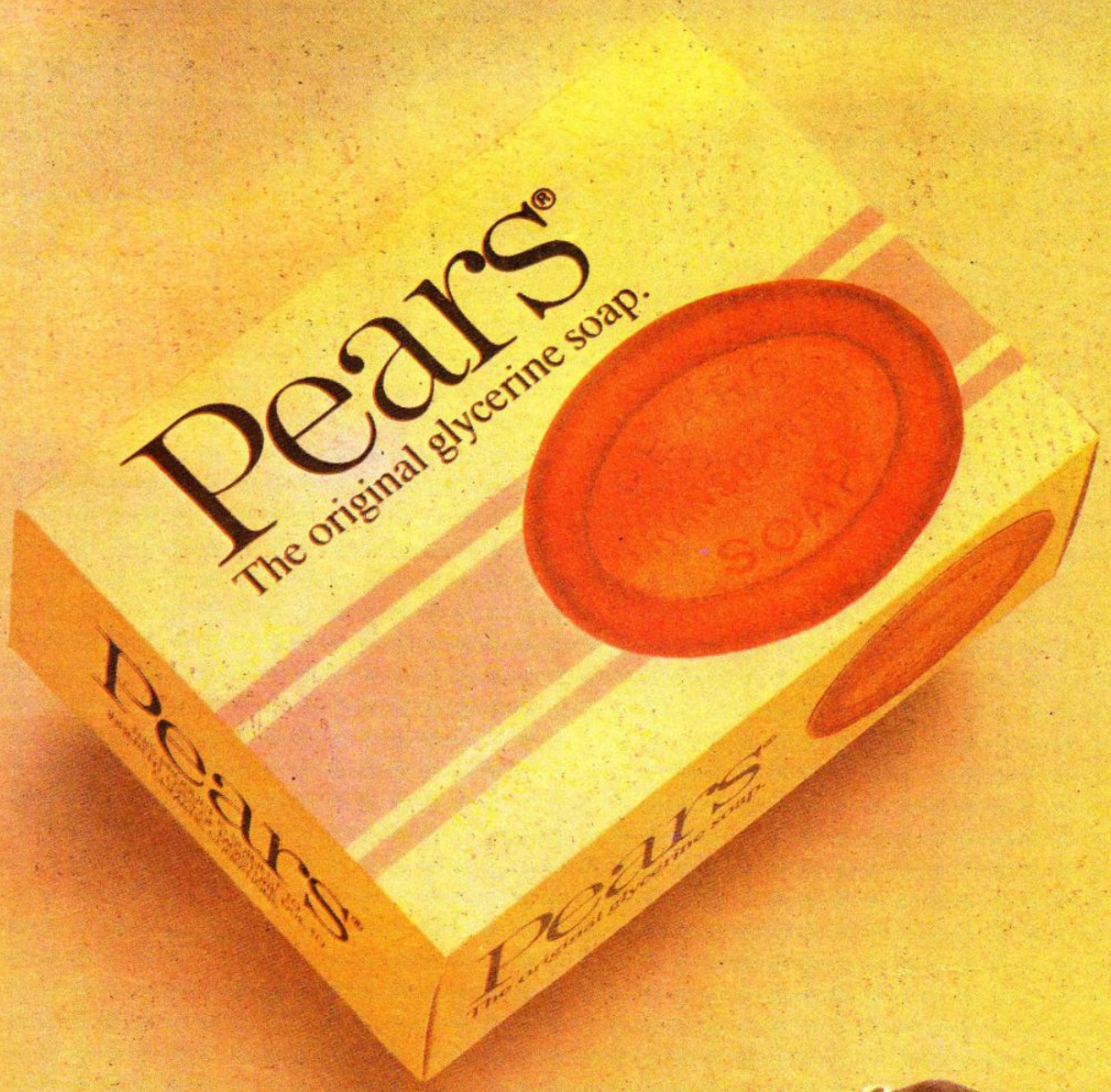

পিয়ার্স এবার এক অপূর্ব সুন্দর নতুন প্যাকে—এক বিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ রূপ, যাতে ঝিলিক মারে ভেতরের সাবানটিরই স্বরূপ! পিয়ার্স—আসল গ্লিসারিন সাবান, যা বদলাতে— না কখনও আপনি চাইবেন, না আমরা!

পিয়ার্স সময়ের ছায়া পড়তে না দিয়ে আপনার ত্বকের গ্লানিহীন তারুণ্য বজায় রাখে!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS PS 62 2619 BG

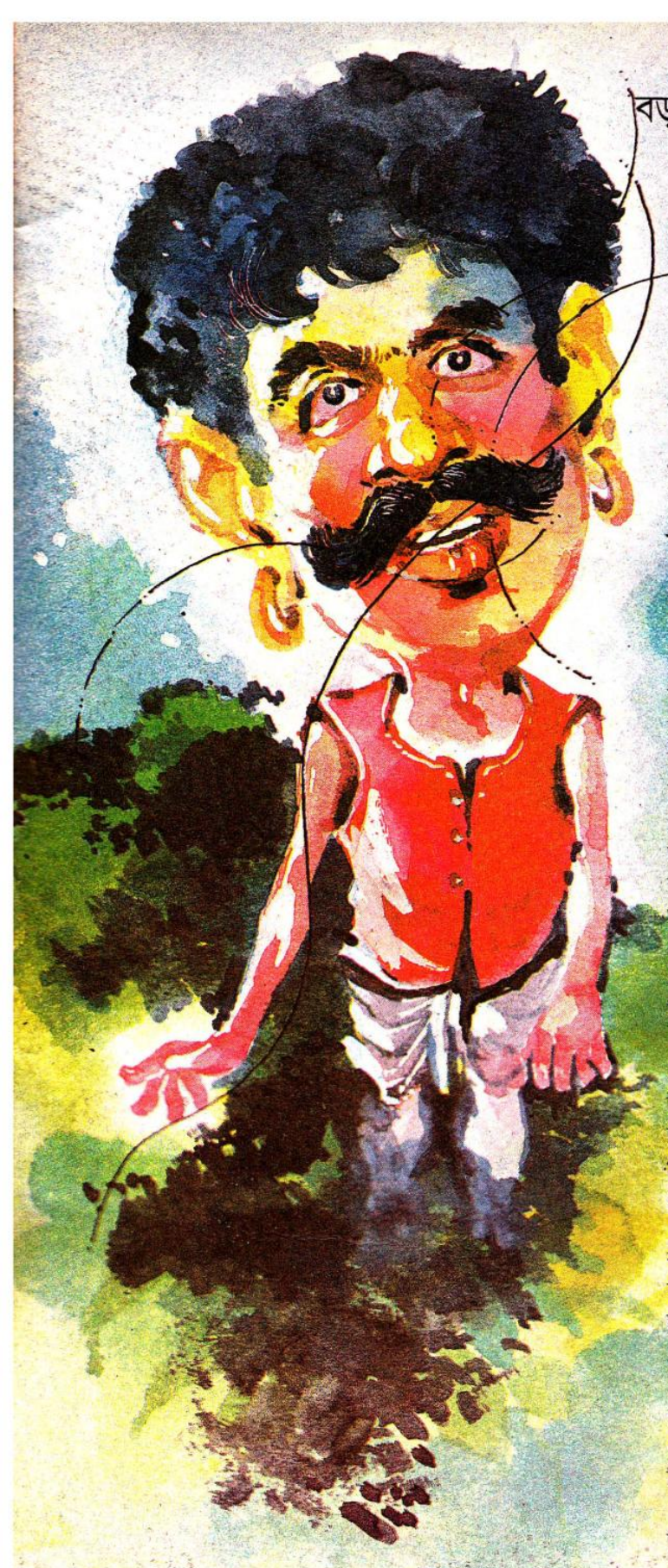

বড়দির হাত থেকে গলগল করে রক্ত ঝরছে

বুজরুক

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বাড়িতে ছোটখাটো চুরি হয়েছে কিংবা কিছু হারিয়ে গেছে, তখন যার ডাক পড়ত, তার নাম ছিল মোনা। এসব ব্যাপারে তার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে সবাই তার নাম দিয়েছিল মোনা বুজরুক।

বুজরুকি সে জানত বটে। ছিঁচকে চোরেরা মোনার বুজরুকিতে ধরা পড়ে যেত আর বেদম পিটুনি খেত। তারপর তারা এলাকা ছেড়েই গা-ঢাকা দিয়েছিল। কিন্তু ধাড়ি চোরেরা বড় সেয়ানা। তারা মোনাকে খুশি রাখার চেষ্টা করত। শোনা যায়, এক অমাবস্যার রাতে তারা দল বেঁধে মোনার পুজো পর্যন্ত দিতে গিয়েছিল। সঙ্গে ফুল, বেলপাতা, ধূপধুনো, আতপচাল, এক বয়োম ঘি, এককাঁদি পাকা কলা ইত্যাদি হরেক উপচার নিয়ে। কিন্তু মোনা বুজরুকের বুজরুকিতে ঠিক তখনই দুঁদে দারোগা তোরাপ খাঁ আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসেন এবং চোর-বেচারারা পিঠটান দেয়। ফুল, বেলপাতা আর ধূপধুনোটা দারোগা মোনার জন্য রেখে বাকি জিনিস থালায় নিয়ে যান। পরে জানা গিয়েছিল ওগুলো সবই চুরির মাল।

মোনার সব বুজরুকিবিদ্যা নাকি তার চুলে। কারণ চুরির খবর পেয়ে এসেই সে পট করে একটা চুল ছিঁড়ে মন্তর পড়ে উড়িয়ে দিত এবং উড়ন্ত চুলের পেছন পেছন হাঁটতে থাকত। চুল গিয়ে চোরের বাড়ির ভেতর ঢুকে তার গায়ের ওপর পড়বেই। তখন বেগতিক দেখে চোর আঁতকে উঠে পালানোর চেষ্টা করবে এবং লোকেরা তাকে তাড়া করে ধরে ফেলবে।

এর ফলে চোরেরা তার চুলগুলো কেটে নেওয়ার চক্রান্ত করেছিল। সেবার দারুণ গরম পড়েছে। মোনা খোলা জায়গায় খাটিয়া পেতে ঘুমোচ্ছে। চোরদের সর্দার যেই তার চুলে কাঁচি চালাতে গেছে, মোনা খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলেছে। কাঁচি ফেলে তারা পালিয়ে বাঁচে।

তবে সেই কাঁচিটাও ছিল চুরির মাল। মকবুল দরজির ঘর থেকে চুরি করে এনেছিল। মকবুল কাঁচিটা ফেরত পেয়ে মোনা বুজরুককে বিনি মজুরিতে একটা ফতুয়া বানিয়ে দিয়েছিল।

মোনার বুজরুকি আমি প্রথম দেখি পিসেমশাইয়ের চটিজুতো হারানোর ঘটনায়।

পিসেমশাই ছিলেন প্রচণ্ড স্বদেশীওয়ালা মানুষ। তখন দেশে ইংরেজের আমল। বিলিতি জিনিস ছিল ওঁর চক্ষুশূল। খদ্দর পরতেন। চরকা কাটতেন। পায়ের জুতো বানিয়ে

নিতেন ভরত মুচির কাছে। একবার ভরত ওঁকে একজোড়া চটি বানিয়ে দিয়েছিল। রাতারাতি তার একটা পাটি উধাও। তন্নতন্ন খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না। পিসেমশাই মনমরা হয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে প্রায় অনশনব্রত পালনের দাখিল। তখন অনশনের খুব হিড়িকও ছিল।

গতিক দেখে ডাকা হল মোনাকে।

মোনা বেঁটে, রোগা গড়নের লোক। পরনে খেঁটে ধুতি, সম্ভবত মকবুল দরজির সেই লাল ফতুয়া। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তামার রিং, হাতে তামার বালা, পেল্লায় গোঁফ। চোখদুটো একেবারে টকটকে লাল। দেখলেই ভয় করে।

সে এসে পট করে নিজের একগাছা চুল ছিঁড়ে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল। চুল উড়ে চলেছে আর পেছন-পেছন চলেছি আমরা বাড়িসুদ্ধু লোক। পিসেমশাই তেতো মুখে অবিশ্বাসে ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন।

সত্যি বলতে কী, চুলটা আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না। বড়দিকে যতবার জিজ্ঞেস করি, খেঁকিয়ে ওঠে, "ওই তো! দেখতে পাচ্ছিস নে, হাঁদা কোথাকার?" ভয়ে-ভয়ে আবার বলি, "কই চুল?" শেষে বড়দি আমার মাথায় চাঁটি মেরে মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, "ওই দ্যাখ! পাচ্ছিস এবার দেখতে?" তখন অগত্যা বলতেই হল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই তো! ওই তো উড়ে চলেছে।"

খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে মোনা যাচ্ছে আগে, তার পেছনে আমরা। ডোবার পাড়ে কলাবন। কলাবন থেকে আমবাগান। সেখান থেকে ভাঙা শিবমন্দিরের বটতলা। তারপর আগাছার জঙ্গলে ঢুকে মোনা চেঁচাল, "খেয়েছে!"

বড়দি আর পিসিমা একগলায় বলল, "কী, কী?"

মোনা খ্যা-খ্যা করে হেসে বলল, "আদ্ধেক খেয়েছে। বাকি আদ্ধেক আছে দেখছি।" এই বলে সে হেঁট হয়ে একপাটি চটিজুতোর শুকতলা তুলে আনল। সবাই তার সঙ্গে বাড়ি ফিরলুম হইচই করে। বড়দি চেরা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে এল "ইউরেকা! ইউরেকা" বলে।

পিসেমশাইয়ের সামনে মোনা চটিটা রেখে বলল, "দেখুন পায়ে ভরে, পায়ের সঙ্গে মিলছে নাকি।"

পিসেমশাই গোমড়ামুখে পা বাড়িয়ে মিলিয়ে নিলেন। বললেন, "মিললে কী হবে হে, এ তো আর পরা যাবে না।"

পিসিমা বললেন, "কিন্তু ওপরকার চামড়াটা কী হল?"

মোনা বুজরুক একগাল হেসে বলল, "তখন বললুম না, খেয়েছে।"

"কিসে খেল তা তো বলছ না বাপু?"

মোনা বসে পড়ল। পকেট থেকে এক টুকরো পোড়া কাঠকয়লা বের করে বলল, "দাঁড়ান তবে। আঁক কষে দেখি।"

সে মাটির ওপর কালো আঁকজোক কেটে অনেক হিসেবনিকেশ করে এবং বিড়বিড় করে মন্তর আওড়ে ফুঁ দিতে থাকল। আমরা ঝুঁকে তাকিয়ে রইলুম আঁকজোকের দিকে। একটু পরে মোনা ফিক করে হেসে বলল, "কুকুরটার দোষ নেই মা! ব্যাটাচ্ছেলের বড্ড খিদে পেয়েছিল।"

বড়দি চেঁচিয়ে উঠল, "ভুলো! ভুলো!"

পিসেমশাই বললেন, "ভুলো মানে?"

"তপুর কুকুর ভুলোকে চেনেন না?"

তপু আমার বড়। সে হাত নেড়ে বলল, "নো, নো, নেভার! ভুলো চামড়া খেতে পারে? ওর হজমই হবে না।"

পিসিমা বললেন, "যত দোষ ভরতের। কাঁচা চামড়ার জুতো দিয়ে ঠকিয়ে গেছে।"

ঠাকুমা ভুলোকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। কারণ প্রায়ই ভুলো ওঁর খাটের তলায় ঢুকে ওত পেতে থাকত। ঠাকুমা বেরিয়ে এলেই তখন ওঁর ছাতুর বয়োম ধরে টানাটানি করত। দাঁতের অভাবে ঠাকুমার খাদ্য ছিল ছাতু।

এতক্ষণে ঠাকুমা লাঠি ধরে নড়বড় করতে করতে বেরিয়ে মোনার উদ্দেশে বললেন, "অ্যাই মোনা! তুই কেমন বুজরুক হয়েছিস, ভুলোকে ধরে এনে আমার সামনে দে তো দেখি। আজ ওকে লাঠিপেটা করে তবে ছাড়ব।"

মোনা বলল, "হুকুম যখন দিয়েছেন কর্তামা, তখন আর কথা কী?"

বলে সে পট করে ফের একগাছা চুল ছিঁড়ে আগের মতো মন্তর পড়ে ফুঁ দিয়ে ছেড়ে দিল। তপুর মুখ চুন সঙ্গে সঙ্গে। উড়ন্ত চুলের পেছনে আবার আমরা ছুটে চললুম। পেছনে তপুর ভ্যাঁ কানে এল। আবার খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে শিবমন্দিরের বটতলা। বড়দি এবার আমাকে খালি খোঁচাতে খোঁচাতে চলেছে, "কী রে, দেখতে পাচ্ছিস তো?" আমি সত্যিসত্যি দেখতে পাচ্ছি না। একটা সূক্ষ্ম জিনিস চুল। যা উড়ে চলেছে দেখতে পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু চাঁটি খাওয়ার ভয়ে বলতেই হচ্ছে, "পাচ্ছি, পাচ্ছি—ওই তো!" তাছাড়া সবাই দেখতে পাচ্ছে আর আমি পাচ্ছি না, তাই বা কী করে হয়? আমাকে সবাই বোকা ভাববে না?

মোনা বুজরুকি জানে বটে। মন্দিরের পেছনে ধসেপড়া ইটের চাবড়া প্রচুর। হঠাৎ সেখান থেকে তপুর আদরের নেড়ি কুকুর ভুলো বেরিয়ে বিকট হাঁচতে শুরু করল। মোনা যেই তার ঠ্যাং ধরতে গেছে, সে লেজ গুটিয়ে গুলতির মতো দৌড়ুতে শুরু করল। সে সমানে 'ছ্যাঁও ছ্যাঁও' করে হাঁচতে হাঁচতে দৌড়ুচ্ছিল।

মোনাও দৌড়ুল। আগাছার জঙ্গল, তারপর চষা খেত। আমরা সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দুজনের রেস দেখতে থাকলুম। একটু পরে দুটিতেই উধাও হয়ে গেলে বড়দি বলল, "আয়! আমরা বাড়ি যাই। মোনা বুজরুক ওকে ধরে আনবে দেখবি।"

জিজ্ঞেস করলুম, "ভুলোর অত হাঁচি হচ্ছিল কেন বড়দি?"

বড়দি গম্ভীর মুখে বলল, "মোনার চুল ভুলোর নাকে ঢুকেছে যে। দেখবি, হাঁচির চোটে ভুলোর কী অবস্থা হয়।"

বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পরে মোনা ফিরে এল খালি হাতে। বলল, "নদী সাঁতরে ওপারে চলে গেল ব্যাটাচ্ছেলে। মড়াখেকো কুকুর যে! দিব্যি সাঁতার কাটতে জানে। নদীতে মড়া ভেসে যায়। এসব কুকুর তাই টেনে এনে খায়। মড়াখেকো না হলে চামড়া খাবে কেন? যাই হোক, দাদাভাই—" সে তপুকে সান্ত্বনা দিল, "কেঁদো না। এবার বরং বিলিতি কুকুর পোষো।"

পিসেমশাই কথাটা শোনামাত্র গর্জে বললেন, "বেরোও! বেরোও বলছি! বুজরুকি দেখাতে হবে না আর। বিলিতি কাপড় গাধায় পরে! বিলিতি কুকুর গাধায় পোষে।"

শেষ বাক্য দুটো যে স্লোগান, মোনা না জানলেও আমরা জানতুম।...

এর পর আরও কিছু বুজরুকি দেখেছিলুম মোনার। বড়দি ডোবায় ছাড়া স্নান করত না। খিড়কির পেছনে ডোবাটা ছিল খুব গভীর। বারোমাস জল থাকত। বড়দি তাতে সাঁতার কাটত। সাঁতার কাটার চোটে কতবার কানের দুল হারিয়েছিল ইয়ত্তা নেই। কিন্তু জলের তলা থেকে দুল উদ্ধার করতে হারু জেলেকেই ডাকা হত। সে জাল ফেলে পাঁক আর শ্যাওলার গাদা তুলে জড়ো করত এবং পাতিপাতি তাই খুঁজে ঠিকই দুল উদ্ধার করে দিত। শেষে মা কড়া নির্দেশ জারি করেছিলেন, "জলে নামবার আগে দুল খুলে রেখে যাবি।"

বড়দি তাই ঘরেই টেবিলের ওপর দুলজোড়া রেখে স্নান করতে যেত। একদিন তা ভুলে গিয়েছিল। ডোবার ধারে গিয়ে মনে পড়ায় সে ঘাটের ওপর কাঠে দুলদুটো রেখে জলে নেমেছিল। তারপর উঠে এসেই মাথায় হাত। একটা দুল নেই। মুখ চুন হয়ে গেল বড়দির। চুপিচুপি আমাকে ডেকে বলল, "নিপু, একবার যা না ভাই—মোনাকে খবর দিয়ে আয়। আমার নাম করে বলবি, খুব দামি সোনার দুল হারিয়ে গেছে। মা জানলে পিঠের চামড়া খুলে নেবে! আর শোন, এদিক দিয়ে চুপিচুপি নিয়ে আসবি ওকে। কেউ যেন টের না পায়।"

বড়দি আবার জলে সাঁতার কাটতে থাকল। আমি গেলুম মোনার বাড়ি। মোনা তার বাড়ির উঠোনে পেয়ারাগাছের তলায় খাটিয়া পেতে শুয়ে ছিল। আমাকে দেখে বলল, "খবর কী দাদাভাই?"

ওকে সব বললুম। শোনার পর মোনা বুজরুক হাই তুলে বলল, "তাই তো! এখন যে একজনের আসার কথা। এসে আমাকে না দেখতে পেলে রাগ করে চলে যাবে। তখন আমার সব বিদ্যা-বুজরুকিও খতম হয়ে যাবে।"

রহস্য টের পেয়ে বললুম, "কে গো বুজরুকদা?"

মোনা চোখে ঝিলিক তুলে বলল, "সে একজন আছে। বললে ছোট ছেলে, ভয় পাবে।"

"না বুজরুকদা! ভয় পাব না। বলো না, কে সে?"

মোনা চাপা স্বরে বলল, "সে মানুষ নয়, বুঝলে তো! শ্মশানের ধারে শিমুলগাছটা দেখেছ কি? সেই যে ডগার দিকটায় বাজ পড়ে কালো হয়ে আছে। ওই হল তার ডেরা। অনেক সাধনা করে তাকে বশ মানিয়েছি।"

"কী সাধনা করেছ বুজরুকদা?"

মোনা হাসল। "সাত-সাতটা কালো বেড়াল বলি দিয়েছিলুম। কালো বেড়াল একটা-দুটো পেতে পারো খুঁজলে। সাতটা কালো বেড়াল খুঁজতে আমাকে কত মুল্লুক ঘুরতে হয়েছিল, জানো তো?"

"কালো বেড়াল বলি দিলে বুঝি লোকটা—"

আমার কথা কেড়ে জিব কেটে মোনা বলল, "লোকটা-লোকটা কোরো না। সে কি লোক?"

"তবে কী সে?"

"যেই হোক, শুধু এটুকু বলতে পারি তোমাকে—সে জ্যান্ত নয়।" বলে সে উঠে পড়ল। "যাক গে! অত করে বলছ যখন, চলো গিয়ে দেখি দিদিভাইয়ের দুল কে চুরি করল।"

খুব ভয়ে-ভয়ে তার দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে

হেঁটে গেলুম—তার সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখেই। তাহলে এতদিনে বোঝা গেল, তার বুজরুকি চুলে নেই। চুলের সঙ্গে আর একজনের গোপন যোগসূত্র আছে—যে জ্যান্ত নয় এবং মানুষ বা লোক-টোকও নয়। ওরে বাবা! ভাবতে গেলে রক্ত হিম হয়ে যায় যে!

ডোবার ঘাটে গিয়ে মোনা বুজরুক যথারীতি একগাছা চুল ছিঁড়ে মন্তর পড়ে ফুঁ দিল। চুলটা আমার চোখের সামনে উড়ে একটুখানি যেতে-না-যেতে মোনা বলে উঠল, "তবে রে!" তারপর চুলের দিকে লক্ষ করব কী, তার দিকেই চোখ গেছে আমার। সে হন্তদন্ত এগিয়ে চলেছে।

বড়দি ঘাটের কাছে ভিজে গায়ে মুখ কালি করে বসে প্যাটপেটে চোখে তাকিয়ে আছে। মোনা একটা শিরীষ গাছে উঠে পড়েছে ততক্ষণে। তারপর দেখি দুটো কাক কা-কা করে তাকে ঠোকরাবার তাল করছে। মোনা কাকের বাসা হাতড়াচ্ছে দেখে অবাক হয়ে গেলুম।

একটু পরে সে নেমে এল। একগাল হেসে বলল, "এই নাও দিদিভাই। চোরের ওপর বাটপাড়ি করে আনলুম। কিন্তু আর যেন যেখানে-সেখানে ভুলে রেখো না। চকচকে জিনিস দেখলেই কাকেরা লোভ সামলাতে পারে না।"

বলেই সে হনহন করে চলে গেল। বুঝলুম, শ্মশানের সেই শিমুলগাছের বাসিন্দার জন্যই এমন করে দৌড়ে গেল বখশিস না চেয়ে।

বড়দি দুলদুটো কানে পরে বলল, "শুনছিস নিপু? কাক দুটোর কেমন হাঁচি হচ্ছে? নাকে মোনা বুজরুকের চুল ঢুকে গেছে যে। দেখবি, হেঁচে ওদের কী অবস্থা হয়।"

প্রতিটি সুস্বাদু খাসা দারুণ মজায় ঠাসা!
বড় আকার!
খেতেও বড় মজাদার!
নিউট্রিন
SuperStar
সেরা টফি চমৎকার
nutrine
SuperStar
DELITE
TWINTREAT
TOPCREAM
টুইন ট্রিট
ডিলাইট
টপ ক্রীম
স্বর্গীয় আনন্দ!
nutrine ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর সুইট
নিউট্রিন কনফেকশানারী কোং প্রাঃ লিঃ চিত্তুর, অ.প্র.

কাকদুটোকে দেখতে দেখতে বললুম, "বড়দি, কাকেরা কি কা-কা করে হাঁচে রে ?"

বড়দি বলল, "তাই তো হাঁচবে। ওরা যে কাক।"

সেদিনই বিকেলে বড়দিকে শ্মশানের বাজপড়া শিমুলগাছের ব্যাপারটা বলে ফেললুম। আর চেপে রাখতে পারছিলুম না। কালো বেড়ালের কথা শুনে বড়দি নেচে উঠল। "এই নিপু ! আমরাও বুজরুক হব। তুই আর আমি—ব্যস ! খবর্দার, তপু-পুপুদের বলবি নে যেন।"

বললুম, "কিন্তু সাতটা কালো বেড়াল কোথায় পাব রে বড়দি ?"

বড়দি চিন্তিত মুখে বলল, "একটা তো পাচ্ছিই। ঠাকুমারটা।"

ঠাকুমার একটা কালো বেড়াল আছে বটে। ভুলো মন আমার ! বললুম, "ঠাকুমা যদি জানতে পারেন !"

বড়দি বলল, "জানবে না। শোন নিপু, আজ রাতেই বেড়ালটাকে ধরে শ্মশানে নিয়ে যাব।"

আপত্তি করে বললুম, "বুজরুকদা বলেছে একটাতে তো হবে না। সাতটা চাই।"

বড়দি চোখ পাকিয়ে বলল, "একটা-একটা করে হোক না। সাত আগে, না এক আগে ? এক দিয়ে শুরু করা যাক। তারপর দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত। বুঝতে পারলি তো এবার ?"

পারলুম। সে-রাতে বড়দি আর আমি বায়না ধরলুম ঠাকুমার কাছে শোব। কতকাল গল্প শুনিনি ঠাকুমার। ঠাকুমা তাতে খুশিই হলেন।

বিরাট খাটে তিনজনে শুয়ে আছি। গল্প শোনাচ্ছেন ঠাকুমা ফোকলা দাঁতে। বোঝা যাচ্ছে না, আর শোনারও কান নেই। কান এবং মন পড়ে আছে ঠাকুমার বুকের কাছে কালো বেড়ালটার ওপর। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি কে জানে !

হঠাৎ 'খ্যাঁক' করে এক বাজখাঁই চিৎকার ঠাকুমার গলা, এবং একইসঙ্গে বড়দির কান্না আমাকে জাগিয়ে দিল। আলো জ্বলছে ঘরে। ঠাকুমাকে দেখলুম হাঁ করে তাকিয়ে আছেন বড়দির দিকে। বড়দি মেঝেয় দাঁড়িয়ে আছে হাত চেপে ধরে। গলগল করে রক্ত ঝরছে। বাড়িতে ততক্ষণে হইচই শুরু হয়ে গেছে।

বুঝলুম, বড়দি ঠাকুমার হুলোকে বেমক্কা ধরতে গিয়েছিল। কামড়ে দিয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে মোনা বুজরুককে ডাকার কথা নয়—ডাকলে সে টের পেয়ে যেত, খুব বাঁচা গেছে। ডাক গেল নাড়ুবাবু ডাক্তারের কাছে।

কিন্তু মোনাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। কদিন পরে মাঠ থেকে খেলে বাড়ি ফিরছি। মোনা বুজরুকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফিক করে হেসে বলল, "শুনলুম দিদিভাইকে বেড়ালে কামড়েছে। বেড়ালটা কালো বটে তো ? হুঁ-হুঁ—তোমাকে বলেছিলুম না—সেই যে গো, শ্মশানের বাজপড়া শিমুলগাছটার কথা ?"

বাকিটা শোনার আগেই আমি এক দৌড়ে একেবারে বাড়ির ভেতর। রক্ত ঠাণ্ডা হিম। গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি কি বুজরুক হতে চেয়েছিলুম নাকি ? বড়দিটাই তো—

ছবি : অনুপ রায়

মিষ্টিকুটুম

রত্নেশ্বর হাজরা

মাদার ডালে মাদারফুল সকালবেলা হাসবে,
ইষ্টিকুটুম মিষ্টিকুটুম, আমার বাড়ি আসবে !
ব্যস্ত হবে আমার দিদি, ব্যস্ত হবেন মা—
আড়িয়ল খাঁ নদীর জলে কালন মাঝির না'—
ওপার থেকে এপার হতে—পার হবে সেই না'য়
মিষ্টিকুটুম, তোমার জন্য হলুদ মাখব গা-য়।

মা বানাবেন তিলের নাড়ু, দিদি কুটবে চিঁড়ে,
মিষ্টিকুটুম, বসতে দেব কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়ে।
ভাইয়া ফেলবে খেপলা জাল, বাবা যাবেন হাটে,
তোমার জন্য হলুদ মেখে নাইতে যাব ঘাটে।
মিষ্টিকুটুম মিষ্টিকুটুম, ইস্‌কাপনের চৌকো
আড়িয়ল খাঁ পার করে দেয় কালন মাঝির নৌকো।
নদীর চড়ায় নরম মাটি, সাবধানে পা রাখবে,
তোমার জন্য মাদারফুল লাল হয়ে কাল থাকবে।

মৌ'কে কী বলেছিল ম্যাজিশিয়ান ?

হিপনোটিজম

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

মেজোমাসির ছেলে মুকুটের কত আর বয়েস হবে ? সবে তো এই ক্লাস সেভেনে উঠল। কিন্তু এরই মধ্যে খুদে ম্যাজিশিয়ান হিসেবে পাড়ায় তার নাম রটে গেছে। ম্যাজিশিয়ানই বটে। ছোট্ট একটা টিনের বাক্সভর্তি তার হরেকরকমের ম্যাজিকের সরঞ্জাম। যেমন তাস, রুমাল, রঙিন কাগজের ফুল, ডজনখানেক রুমাল, কাঠের বল, কিউব আরও কত কী ! পাড়ায় যেখানেই ফাংশান সেখানেই মুকুট।

নেমন্তন্নবাড়ির কলাপাতায় যেমন প্রথমে নুন আর লেবু তেমনি নাচ-গান, বাজনার আগে এই খুদে ম্যাজিশিয়ানের মিনিট-কুড়ি-পঁচিশের একটা ম্যাজিক শো থাকবেই। এটুকু ছাড়া যেন সবই আলুনি। আর ম্যাজিক মানে সব সত্যিকারেরই ম্যাজিক। ম্যাজিক নিয়ে মজা নয় মোটেই। কুচি-কুচি কাগজ গিলে গলা থেকে কাগজের মালা বের করা, ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া, ফাঁকা চোঙের ভিতর হাত ঢুকিয়ে এত রুমাল বের করা যে তাতে গোটা চন্দননগর মুড়ে দেওয়া যায়। চোখ বেঁধে বোর্ডে অঙ্ক কষা ইত্যাদি···ইত্যাদি···।

ম্যাজিশিয়ানই যে ভবিষ্যতে হবে মুকুট, তা ছেলেবেলা থেকেই বোঝা গিয়েছিল। কী চোখেমুখে কথা ! ওর ছেলেবেলায় কিছু-কিছু গল্প তো বাড়িতে প্রায় কিংবদন্তী হয়ে আছে।

যেমন, সিক্কিমে ছোটমামার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে প্রথম দর্শনেই বলা নেই কওয়া নেই ছোটমামার ছেলেকে ঠাশ করে এক চড়। সবাই তাজ্জব। মেজোমাসি খুব রেগে ধমক দিয়ে বললেন, "ছোট ভাইকে তুমি খামোখা মারলে কেন মুকুট ?"

"বাহ্ রে ! খামোখা বুঝি ?" আকাশ থেকে পড়ে মুকুট। "ও যদি আগে আমাকে মারে ! তাই আমি আগেই ওকে মেরে রাখলাম।"

সেবার স্কুল থেকে ফিরে এসে মুকুট বলল, "মা, আমার পেনসিলের বাক্সটা হারিয়ে গেছে—কোথাও পাচ্ছি না।"

মেজোমাসি বললেন, "তবে আর কি, নাচি আমি ?"

মুকুট সত্যিকারের অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "তুমি নাচ জানো মা ?"

বিজয়ার নাড়ু পাকিয়ে গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন মেজোমাসি। কিন্তু যে ছেলে বড় হয়ে নির্ঘাত ম্যাজিশিয়ান হবে তাকে ফাঁকি দেওয়া সোজা কথা ? যথারীতি খেপে-খেপে নাড়ু বয়াম থেকে উধাও। কিন্তু লোভটা বোধহয় একটু বেপরোয়াই হয়ে উঠেছিল, ফলে মেজোমাসির হাতে একেবারে বমাল গ্রেফতার। মেজোমাসি গম্ভীর গলায় বললেন, "চুরি করলে কেন মুকুট ? চাইলে আমি দিতাম না ?"

"সত্যি ?" নাড়ুঠাসা মুখে কোনোরকমে বলে মুকুট। "চাইলেই দেবে মা ? দাও না মা, আরও একটা নাড়ু।"

তা এই ছেলে যে ম্যাজিক দেখিয়ে সবাইকে ভেল্‌কি লাগিয়ে দেবে তাতে আর আশ্চর্য কী ?

কিন্তু এই ছেলেই নিজে একবার কেমন বেমালুম বোকা বনে গিয়েছিল সেই গল্পই বলছি।

চন্দননগর টাউন হলে সেবার নরেশকুমার বলে এক

ম্যাজিশিয়ান এসেছেন শো দেখাতে। সে নাকি সব দুর্দান্ত ম্যাজিক। দারুণ হৈ-চৈ পাড়ায়। সবার মুখেই শুধু নরেশকুমারের কথা। টাউন হলের সামনে বেজায় ভিড়। ঠিক হল রোববার মেজোমাসিরাও দল বেঁধে যাবেন ম্যাজিক শো দেখতে। রোববার সব সেজেগুজে তৈরি, কিন্তু মুকুটের কোনো গা নেই। নিজের ম্যাজিকের বাক্সটা নিয়ে খুটখুট করছে।

মেজোমাসি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, "কী রে, তুই যাবি না মুকুট ? ম্যাজিক শিখতে গেলে তো অন্যদের খেলাও দেখতে হয়।"

মুকুট বড়দের মতো গম্ভীর গলায় বলে, "কী আছে শেখার ? নরেশকুমার নরেশকুমার করে সব পাগল হয়ে গেলে। ফুঃ ! তাস দিয়ে মালা বানানো রুমাল থেকে পায়রা বের করা এসব আবার ম্যাজিক নাকি ? আমি ওর থেকে অনেক ভাল ম্যাজিক দেখাতে পারি।"

"হ্যাঁ। তুমি তা পারো। তুমি তো পি তি তরকার।" পাশ থেকে মেজোমাসির মেয়ে মৌ ফুট কাটে। ওই আরেক মেয়ে। যেমন দাদা তার তেমনি বোন। এখনও জিভের আড় ভাঙেনি, কিন্তু চোখেমুখে কথা। আর দাদার সঙ্গে সবসময় পায়ে পা বাধিয়েই আছে। দিনে দশবার করে কথা বন্ধ, দশবার করে ভাব।

মুকুট চোখ পাকিয়ে বলে, "বড়দের কথায় কে থাকতে বলেছে তোমাকে ? মারব এক থাবড়া।"

"ইত্, মেরে দ্যাখোই না।"

মেজোমাসি ধমক দিয়ে বললেন, "এই তোমাদের শুরু হল ! দুজনকে এবার ঘরে বন্ধ করে রেখে যাব। দেখি কতক্ষণ ঝগড়া করতে পারো।"

শেষ অবধি অবশ্য ম্যাজিক দেখতে যেতেই হয় মুকুটকে।কিন্তু ভাবখানা যেন একজন বয়স্ক লোক, এই একটু শখ করে ছেলেমানুষি মজা দেখতে এসেছে।

হলভর্তি লোক। মেজোমাসিরা বেশি দামের টিকিট কেটে একেবারে সামনের দিকে বসেছেন। যেমনি জমকালো রাজার মতো পোশাক নরেশকুমারের, তেমনি রাজপুত্তুরের মতো চেহারা, আর চোখ-ধাঁধানো সব খেলা। হাঁ করে দেখছে সবাই। নিজের মনে হাসে মুকুট। এত সহজ-সহজ সব ম্যাজিক, ধরতে পারছে না এত বড়-বড় সব লোক !

হঠাৎ মঞ্চ একেবারে আলকাতরার মতো অন্ধকার। পরমুহূর্তেই নীল-বেগুনি রঙের একটা আলো। মঞ্চের মাঝখানে নরেশকুমার দাঁড়িয়ে বেদুইনের পোশাকে কোমর বেঁকিয়ে বাও করছেন দর্শকদের। "আমার প্রিয় দর্শকবৃন্দ, এবারের খেলার নাম মিশরের মমি। গত বছর কায়রো থেকে লণ্ডন যাওয়ার পথে আমাদের প্লেন খারাপ হয়ে সাহারা মরুভূমিতে নেমে পড়ে। একদল বেদুইন-দস্যু ঘিরে ফেলে আমাদের প্লেন। দর্শকবৃন্দ, আপনারা বুঝতেই পারছেন কী ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম আমরা। হঠাৎ দলের সর্দার এগিয়ে এসে আমাকে পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি ইণ্ডিয়ান ?' আমি মাথা নাড়তেই, জিজ্ঞেস করল,'ম্যাজিক জানো ? সব ইণ্ডিয়ানই তো ম্যাজিক জানে।' আমি আবার মাথা নাড়তে বলল,'ঠিক আছে। দ্যাখাও ম্যাজিক। ভাল ম্যাজিক দেখাতে পারলে কোনো ভয় নেই তোমাদের। আসলে আমরা অনেকদিন থেকেই একজন ম্যাজিশিয়ান খুঁজছি যে ট্রেনিং দিতে পারবে। আমাদের

বেদুইনরা কেউ ম্যাজিক জানে না।' প্লেনের যাত্রীরা সবাই তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। তা সেই মুহূর্তেই একটা নতুন ম্যাজিক বানিয়ে ফেললাম। মিশরের মমি। দেখে তো সবাই তাজ্জব। প্লেনের সবাইকে ছেড়ে দিল কিন্তু আমাকে ছাড়ল না। উটের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গেল ওদের তাঁবুতে। পাকা তিনটি মাস সেখানে আটকে রাখল আমাকে। হরেকরকম ম্যাজিক শিখিয়ে তবে ছুটি। এবার দেখুন দর্শকবৃন্দ, মি-শ-রে-র ম-মি।" ঝ্‌ঝ্‌নন্ ঝ্‌ঝ্‌নন্ শব্দে বঙ্গো ম্যারাকস বেজে উঠল। নরেশকুমার মঞ্চ থেকে সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "এ খেলার জন্য দরকার চারটি খুব ছোট-ছোট মেয়ের। এসো দেখি খুকি তুমি!" আর আঙুল নাচিয়ে প্রথমেই ডেকে বসেন মৌ-কে। মৌ তো ভয়ে, লজ্জায় জড়সড়। মেজোমাসিকে জড়িয়ে ধরেছে। মেজোমাসি ফিসফিস্ করে বলেন, "বোকা মেয়ে, ভয় কী, ওই দ্যাখো, ওরাও উঠেছে স্টেজে। ওরকম করতে নেই। সবাই হাসবে।"

অগত্যা উঠতেই হয় মৌকে। সঙ্গে তার বয়সী আরও তিনটি মেয়ে। নরেশকুমার লাইন দিয়ে চারজনকে দাঁড় করান মঞ্চের পেছন দিককার কালো পর্দার গায়ে। মেয়ের বাবা-মায়েরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। নরেশকুমার এগিয়ে এসেই হাতের জাদুকাঠিটা আরতির মতো ওদের মুখের সামনে নাড়াতে থাকেন। আর তারপরই অবাক কাণ্ড। দেখতে দেখতে চোখ বুজে আসে তাদের, তারপর ধপ্ করে একে একে পাশের বেঞ্চে বসে পড়ে সবাই। নিথর নিস্পন্দ। দর্শকরা সব নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে—হিপ্‌নোটিজম, হিপ্‌নোটিজম।

মুকুট তো হাঁ। সত্যি হিপ্‌নোটিজম! কই, এরকম কোনো ম্যাজিকের কথা তো বইয়ে পড়েনি সে।

নরেশকুমার আবার দু-হাত তুলে সরু গোঁফের ফাঁকে মিষ্টি হেসে বলেন, "প্রিয় দর্শকবৃন্দ, দেখুন একেই ইংরিজিতে বলে হিপনোটিজম বা মেসমেরিজম। অর্থাৎ সম্মোহন। এই মেয়েরা সবাই সম্মোহিত হয়ে আছে। বেদুইন-দলের সর্দারকেও এইরকম সম্মোহিত করে ফেলেছিলাম আমি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইভাবে রুগিদের উপর অপারেশন করা হত। এবার দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখুন ছোট্ট একটা তাসের ম্যাজিক। ততক্ষণ ওরা ওভাবেই সম্মোহিত অবস্থায় থাক্।"

বাবা-মায়েরা উসখুস করছে। কী হবে মেয়েগুলোর। চারজনই যে কালো পর্দার গায়ে একেবারে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। মেজোমাসিও খালি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। নরেশকুমার কিন্তু বেশিক্ষণ উৎকণ্ঠায় রাখলেন না ওঁদের। তাসের ম্যাজিকটা শেষ করেই সামনে এগিয়ে গেলেন, তারপর জাদুকাঠিটা আবার আরতির মতো করে নাড়ালেন। মুহূর্তে চোখ কচলে উঠে বসল মেয়েরা চৌকির উপর, তারপর স্টেজ ছেড়ে সোজা যে-যার বাবা-মায়ের কাছে দৌড়। হাততালিতে ফেটে পড়ে গোটা হলঘর।

সারা রাস্তা মুকুটের মুখে আর রা নেই। নরেশকুমার তাকে একেবারেই বুদ্ধু বানিয়ে দিয়েছেন।

পরদিন দুপুরবেলা নিরিবিলি পেয়ে ধরল মৌ-কে। "এই শোন্। লোকটা চোখের সামনে হাত নাড়তে চোখ বন্ধ করলি কেন রে? কোনো মন্ত্র-টন্ত্র পড়ছিল?"

"লজ্জা করে না আমার সঙ্গে কতা বলতে? তোমার তঙ্গে না আড়ি।" মৌ গটগট করে হাঁটা দেয়। ইচ্ছে করে মুকুটের চুল ধরে মারে এক হ্যাঁচকা টান। কিন্তু না, তাতে কার্যোদ্ধার হবে না। যা বিচ্ছু মেয়ে।

খুব নরম গলায় পিছু ডাকে মুকুট,"শোন্ মৌ।"

"এ মা! আড়ি খেয়ে কতা বলে, এ-এ-মা—"

নাঃ সহজে হবে না বোঝা যাচ্ছে। পকেট থেকে এবার ব্রহ্মাস্ত্রটা বের করতেই হয় মুকুটকে। সুদৃশ্য রুপালি নীল রাংতায় মোড়া লম্বা চকোলেটটা। টিফিনের জমানো পয়সা দিয়ে মোড়ের দোকান থেকে কেনা। ভেবেছিল বিরাট সাইজের গোটা কয়েক তাস কিনবে। যার উপর আঙুল চালালেই রঙের ফোঁটা পালটে যাবে। সবে ম্যাজিকটা শিখেছে মুকুট। কিন্তু তা আর হল না। না হোক। মেসমেরিজমের রহস্যটা তার জানা চাই-ই চাই।

বেড়ালের মতো জুলজুল্ চোখে চকোলেটের দিকে তাকায় মৌ। মুকুট খুব দরদমাখানো গলায় বলে, "নে, ধর মৌ। তোর জন্যই আনা রে। তোকে তো কেউ লজেন্স-চকোলেট দেয় না। চল ছাতে যাই, কেমন। মা আবার না দেখে ফেলে।"

"তুমি আবার এর থেকে ভাগ নেবে না তো?" খুবই সন্দিগ্ধ চোখে দেখে ও মুকুটকে।

"ছিঃ। ওইটুকুন তো জিনিস। আমি ভাগ নিলে তোর আর থাকবে কী রে।"

একটা দাঁতে পোকা লেগেছে বলে লজেন্স-চকোলেট খাওয়া একদম বারণ মুকুটের। চকোলেটটার দিকে তাকিয়ে মৌ হুকুম দেওয়ার মতো গলায় বলে, "দাও ওতা। আর সিঁড়ির মুখে বসে পাহারা দাও গে যাও। খবর্দার। আমি না বলা অবধি একদম উতবে না।"

উঃ, হুকুম চালাচ্ছে কী দ্যাখো না! যেন সুলতানা রিজিয়া। কিন্তু উপায় কী! নিঃশব্দে হুকুম পালন করতেই হয় মুকুটকে। চিলেকোঠার সিঁড়িতে বসে পা দুলিয়ে-দুলিয়ে তরিবত করে খায় মৌ। উঃ ভগবান, আস্ত একখানা চকোলেট। মুকুটের একমাসের জমানো টিফিনের পয়সা। চকাস-চকাস শব্দে চলে যাচ্ছে হ্যাংলা মেয়েটার পেটে। চোখে দেখা যায় এই দৃশ্য!

মুকুট আস্তে আস্তে এবার জিজ্ঞেস করে, "কই, বললি না মৌ?

"বাবা রে, তুমি বদ্দ ব্যত্তবাগিত্। দাঁড়াও, চেতেপুতে খেয়ে নি। চলে এলে যে এদিকে! পাহারা কে দেবে?"

চকোলেটটা সাবাড় করার পরেও বেড়ালের মতো ঠোঁট চাটতেই থাকে মৌ, তারপর বলে, "হ্যাঁ, কী বলতিলে যেন দাদা?"

কায়দা দ্যাখো ওই দেড়-আঙুলে মেয়ের। কোনোমতে রাগ সামলে বলে মুকুট, "বলছিলাম নরেশকুমার চোখের সামনে লাঠিটা নাড়বার সময় তোরা চোখ বন্ধ করলি কেন রে? কোনো মন্ত্র-টন্ত্র পড়ছিল নাকি রে?"

"ওমা! মন্ত্র পড়বে কেন? মন্ত্র পড়েনি তো। খালি বলল, খুকি, আমি চোখের সামনে হাত আনলেই চোখ বন্ধ করবে, আর আমি আবার চোখ খুলতে বললেই খুলবে। তো, তাই করলাম। বড়দের কথা সবসময় থুনতে হয়, বল্ দাদা।"

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে অনেকরকম বাগান করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানকার লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে কিছুই সূত্র পাওয়া গেল না। দিপু তার দিদিকে কিছু না জানিয়ে মাঝরাতে বাইরে বেরিয়ে পুকুরধারে একজন রহস্যময় মানুষের দেখা পেল। তারপর দিপুও আর ফিরে এল না। সকালবেলা ইরানি তার ভাইকে খুঁজে না পেয়ে গেল থানায় খবর দিতে। এদিকে দিপুর ঘুম ভাঙল এক অচেনা জায়গায়। সেখানে সেই রহস্যময় মানুষ আর জ্যাঠামশাইয়েরও দেখা পেল সে, কিন্তু সেখান থেকে ফেরার উপায় সে জানে না। তারপর ...

দিপু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখানে এলাম কেন ? এই রাস্তায় কী দেখবার আছে ?" ডমরুজি হাসলেন। তারপর বললেন, "এমনিতে এ-রাস্তাটাতে দেখার কিছুই নেই। দেখতেও সুন্দর নয়। তা ছাড়া বড্ড লোকজনের ভিড় আর গোলমাল, তাই না ? কিন্তু ওই দিকে তাকিয়ে দেখো তো, কিছু মনে পড়ে কি না ?" ডমরুজি একদিকে আঙুল তুলে দেখালেন। সেখানে একটা মোটর গারাজ। দু'তিনটে ভাঙাচোরা গাড়ি রাস্তার ওপরে পড়ে আছে। সেখানে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে একজন লম্বা চেহারার মানুষ মাটির ভাঁড়ে চা খেতে খেতে ঠিক সেই সময় পেছন ফিরে তাকাল।

দিপু চমকে উঠে বলল, "ডাক্তারকাকা ! উনি এখানে কী করছেন ?"

ডমরুজি বললেন, "চলো, আর একটু কাছে এগিয়ে যাওয়া যাক।"

এত ভিড়ের মধ্যেও ওদের এগিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে হল না। কেউ ওদের দেখতে পাচ্ছে না, কারুর গায়ে ধাক্কা লাগছেও না।

মোটর গারাজের খুব কাছাকাছি এসে দিপু আবার চমকে উঠল, সে ডেকে উঠল, "বাবা !"

সত্যি একটা কাঠের টুলে বসে আছেন দিপুর বাবা। মুখে খানিকটা ক্লান্তির ছাপ। তিনিও ভাঁড়ের চা খাচ্ছেন, আর কথা বলছেন পাশের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে।

দিপু নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। বাবা, ডাক্তারকাকা এই একটা অচেনা শহরে কী করছেন ? বাবার অসুখ সেরে গেলেও এখানে আসবেন কেন ? আর ডাক্তারকাকা অত ব্যস্ত মানুষ !

দিপু ছুটে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই ডমরুজি মুচকি হেসে বললেন, "কোনও লাভ নেই ! কোনও লাভ নেই ! তুমি তো ওঁদের স্বপ্নে দেখছ !"

দিপু থেমে গিয়ে বলল, "ও ! স্বপ্নে তো অনেক কিছু উল্টোপাল্টা দেখা যায়। বাবা তা হলে বাড়িতেই আছেন।"

"উঁহু ! উনি এখানেই এসেছেন।"

"আপনি কী যে বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। একবার বলছেন স্বপ্ন, একবার বলছেন সত্যি !"

"তোমার আর তোমার দিদির কোনও খোঁজ না পেয়ে তোমার বাবা-মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই ওঁরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছিলেন তোমাদের খোঁজে।"

"আমাদের খোঁজে ওঁরা এখানে আসবেন কেন ?"

"ওঁরা আসছিলেন পুলিশের একটা জিপগাড়িতে। ওই যে তোমার বাবা যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, তিনি পুলিশ অফিসার। রাস্তায় খুব ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিলেন, জিপটা উল্টে গেল। যাই হোক, বেশি বিপদ হয়নি, কারুর তেমন লাগেনি। কিন্তু গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। তাই গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসেছেন এখানে। গাড়ি ঠিক না হলে তো আর যেতে পারবেন না !"

"আপনি এত সব কথা জানলেন কী করে ?"

"সেটা তোমাকে বুঝিয়ে বলা মুশকিল। আমি কী করে যেন সব জেনে যাই।"

"আপনি এমন সব কথা বলছেন, আমার মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে। আপনি সব সত্যি কথা বলছেন তো ?"

"আমি মিথ্যে কথা একদম বলতেই পারি না !"

"বাবা আমাদের জন্য চিন্তা করছেন, আপনি বাবাকে আমার আর দিদির খবর আর জ্যাঠামশাইয়ের খবর জানিয়ে দিন না !"

"তার যে কোনও উপায় নেই। খবর জানানোর উপায় নেই। তবে আমি একটা কাজ করতে পারি, সেটা তো তোমাকে একটু আগেই বললুম। তোমার সঙ্গে আমার পুকুরপাড়ে যেখানে দেখা হয়েছিল, ঠিক সেইখানে তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারি।"

"জ্যাঠামশাইকে বাদ দিয়ে ?"

"উনি যে যেতে চাইছেন না। আমি জোর করতে পারি না !"

"জ্যাঠামশাইকে আপনি নিয়ে এসেছেন কেন আপনার কাছে ? আপনি ..."

কথা বলতে বলতে দিপু থেমে গেল। তার বাবা তার থেকে মাত্র পাঁচ-ছ'হাত দূরে বসে আছেন। মনে হচ্ছে যেন তিনি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন দিপুর দিকেই। তা হলে কি বাবা দেখতে পাচ্ছেন তাকে ?"

দিপু আরও এগিয়ে গিয়ে বলল, "বাবা, আমি জ্যাঠামশাইকে খুঁজে পেয়েছি !"

বাবা মুখ ফিরিয়ে বললেন, "গাড়িটা সারাতে আর কত দেরি ?"

দিপু আবার খুব জোরে বলল, "বাবা, আমি এখানে ! আমরা ভাল আছি ! আমাদের কোনও বিপদ হয়নি !"

বাবা বললেন, "আর একটা গাড়ি ভাড়া করা যায় না ? এত দেরি হচ্ছে, আমার একটুও ভাল লাগছে না !"

দিপু হতাশ হয়ে গেল। বাবা সত্যিই শুনতে পাচ্ছেন না তার কথা। দিপু বাবার হাত চেপে ধরল। বাবা অনায়াসেই

জনসন্স বেবী লোশন
কেননা নরম ত্বক
আপনার বয়সকে গোপন করে রাখে

জনসন্স বেবী লোশন
একটি কোমল, গোলাপী লোশন...
ত্বককে কোমল রাখার ইমোলিয়েন্ট-এর
মিশ্রণ যা আপনার ত্বকের নিজস্ব আর্দ্রতা
বজায় রাখার তরল পদার্থের মতই
কাজ করে।

তরুণ ত্বকে এই তরল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকায় এটি আপনার স্বাভাবিক কোমলতা ও নমনীয়তা বজায় রাখে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ত্বককে কোমল রাখার প্রাকৃতিক ইমোলিয়েন্ট শুকিয়ে যেতে শুরু করে।

আপনার ত্বক তেলতেলে হলেও এমনটি হতে পারে। কেননা আপনার ত্বকের কোমলতা নির্ভর করে শুধুই তার আর্দ্রতার ওপর। তেলতেলে শুকনো হওয়ার উপর নয়।

আপনার ত্বক যে রকমই হোক না কেন, জনসন্স বেবী লোশন আপনার ত্বকের নিজস্ব স্বাভাবিক তরল পদার্থের সাথে একযোগে কাজ করে। তাতে আনে প্রাণের জোয়ার ও আপনার রঙরূপে পুষ্টি যোগায়।

একটুখানি জনসন্স বেবী লোশনে কাজ পাওয়া যায় অনেক। এটি তেলতেলে নয় এবং এটি আপনার ত্বকে এত দ্রুত শুষে যায় যে এর কাজ শুরু হওয়া আপনি অনুভব করবেন। এটি আপনার ত্বককে কোমল রাখবে।

বয়সের চেয়ে আপনাকে ছোট দেখাবে।

জনসন্স বেবী লোশন। আপনার ত্বক কিছুতেই আপনার বয়স প্রকাশ করতে পারবে না।

সেই হাত তুলে মুখ মুছলেন।

দিপু স্বপ্নের মধ্যেই তা হলে বাবাকে দেখছে! স্বপ্ন কখনও হুবহু বাস্তবের মতন হয়?

দিপু পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল ডমরুজি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তাহলে দিপু এখন কী করবে, এই স্বপ্নের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকবে?

সঙ্গে-সঙ্গে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একেবারে ঘন কুচকুচে অন্ধকার। তার মধ্যে শুধু শোনা যাচ্ছে একটা কোনও পাখির ডাক। সেই পাখির ডাকটা তার মায়ের গলার আওয়াজের মতন। মা যেন ডাকছেন, 'দিপু!. দিপু!'

আবার আলো ফুটল আস্তে আস্তে। দিপু দেখল সে শুয়ে আছে আমবাগানে, ঘাসের ওপর। ওপরে আমগাছের ডালে বসে সত্যিই একটা কোকিল 'কুহু কুহু' করে ডাকছে।

দিপু আস্তে-আস্তে উঠে বসল। এবারে কি তার ঘুম ভেঙেছে, না এটাও স্বপ্ন? কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

কাছেই বসে আছেন জ্যাঠামশাই। তিনি মাথা নিচু করে ঝুঁকে গভীরভাবে কী যেন দেখছেন মাটিতে।

দিপু আলতোভাবে ডাকল, "জ্যাঠামশাই!"

জ্যাঠামশাই মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর বললেন, "কীরে দিপু, এখন কেমন লাগছে?"

জ্যাঠামশাই তার কথা শুনতে পেয়েছেন, তা হলে বোধহয় এটা স্বপ্ন নয়। কিংবা, দু'জনে আবার একই স্বপ্নের মধ্যে!

দিপু বলল, "জ্যাঠামশাই, কী যে হচ্ছে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। একটু আগে বাবাকে দেখলুম।"

জ্যাঠামশাই একটুও অবাক না হয়ে কৌতুকের সুরে বললেন, "তাই নাকি? কেমন আছে খোকন? আমি যে কেন ওদের দেখতে পাই না! তোর মা'কে দেখতে পাসনি?"

"না।"

"তুই আর এখানে থেকে কী করবি, দিপু? তুই ছেলেমানুষ, তোর বেশিদিন ভাল লাগবে না। তা ছাড়া তোর জন্য সবাই চিন্তা করবে।"

"জ্যাঠামশাই, আমি তো আপনাকে খুঁজতেই কলকাতা থেকে এসেছি।"

"আমার খোঁজ তো পেলি। দেখলি আমি কত ভাল আছি। এবারে ফিরে গিয়ে সবাইকে সেই কথা বলিস!"

"কী বলব? সবাই যখন জিজ্ঞেস করবে, আপনি কোথায় আছেন, কী উত্তর দেব?"

"হ্যাঁ, সেটা খুব শক্ত বটে। লোককে বোঝানো যাবে না। তুই বরং বলিস যে, জ্যাঠামশাই সাধু হয়ে চলে গেছেন। আমি অনেক করে বোঝালুম, তবু তিনি ফিরে এলেন না!"

"জ্যাঠামশাই, আপনি এখানে এলেন কী করে? ওই যে উনি, ডমরুজি, ওঁকে কি আপনি আগে চিনতেন?"

"নাঃ! তবে একবার চেনার পর আর আমি ওঁকে ছাড়তে চাই না। লোকটি অদ্ভুত-গুণী, বুঝলি!"

"উনি কি অন্য পৃথিবী থেকে এসেছেন? আমাদের মতন মানুষ নন?"

"না, না, এসব কথা কে বলল তোকে? উনি আমাদেরই মতন মানুষ। খুব বড় তান্ত্রিক সাধক। কিন্তু উনি মাঝখানে আটকা পড়ে গেছেন।"

"তার মানে?"

"ওদের সাধনার একটা স্তর আছে, বুঝলি! একটা বিশেষ সাধনা আছে, যার জোরে এইসব মানুষরা মাটি থেকে শূন্যে উঠে যেতে পারেন, অদৃশ্য হয়ে বিচরণ করতে পারেন, ইচ্ছেমতন স্বপ্ন সৃষ্টি করতে পারেন। বড়-বড় সাধকদের এইরকম ক্ষমতা থাকলেও তা অন্য কারুকে বলেন না। আমাদের এই ডমরুজি ঠিক সাধু নন। আগে ছিলেন ম্যাজিশিয়ান। নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে ম্যাজিক দেখাতেন।"

দিপু এবারে খানিকটা উৎসাহিত বোধ করল। ও, ম্যাজিশিয়ান, তা হলে তো খুব ভয় নেই। ম্যাজিশিয়ানরা হিপনোটিজম জানে। লোকের চোখের দিকে তাকিয়ে যা বলে, লোকে তাই বিশ্বাস করে। কমিক স্ট্রিপের ম্যানড্রেক যেমন দস্যুদের হাতে রাইফেল দেখে বলে ওঠেন, ওটা তো রাইফেল নয়, সাংঘাতিক একটা সাপ, অমনি দস্যুরা সত্যি-সত্যি রাইফেলটাকে সাপ ভেবে ভয় পেয়ে মাটিতে ফেলে দেয়!

দিপু বলল, "আমাদের হিপনোটাইজ করে রেখেছে?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "না রে, বোকা। এটা সেরকম ব্যাপার নয়। শোন আগে আসল ব্যাপারটা। ডমরুজি তো ম্যাজিশিয়ান ছিলেন আগে। উনি শুনেছিলেন যে, সাধু-সন্ন্যাসীরা অদৃশ্য হবার মন্ত্র, আকাশ দিয়ে চলাচল করার উপায় জানে। উনি অনেক সাধুর কাছে ঘুরতে লাগলেন সেই গুপ্তবিদ্যা শেখার জন্য। বেশির ভাগ সাধুই কিন্তু ওই বিদ্যা জানে না। মিথ্যে কথা বলে। ঘুরতে ঘুরতে ডমরুজি একজন সাধুকে পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তিনি অর্ধেকটা জানেন, পুরো জানেন না। ডমরুজি সেটাই শেখার জন্য জোর করতে লাগলেন। এখন ওঁর অবস্থা হয়েছে অভিমন্যুর মতন। তুই অভিমন্যুর কাহিনী জানিস তো?"

"হ্যাঁ, জানি। চক্রব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, আর বেরুতে পারেনি।"

"ঠিক তাই। ডমরুজি আর কিছুতেই বেরুবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। তার ফলে অবশ্য আমার খুব লাভ হয়েছে। ওঁর সঙ্গে দেখা না হলে কি জানতে পারতুম যে, আমাদের চোখে দেখা জগতের পাশাপাশি আর একটা জগৎ আছে? আমরা খালি চোখে যত জীবজন্তু বা মানুষ দেখি, তার বাইরেও আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, যাদের অন্য কেউ দেখতে পায় না। নতুন-নতুন রং আছে। গাছেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে, ঝগড়া করে। রোদ্দুরের মধ্যেও যেন বৃষ্টি পড়ে।"

"ডমরুজির সঙ্গে আপনার দেখা হল কী করে?"

"উনি মাঝে-মাঝেই জোর করে ফিরে যাবার চেষ্টা করেন। উনি একদিন আমার পেয়ারাবাগানে নামবার চেষ্টা করেছিলেন।"

"যে পেয়ারাবাগানটা পুড়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। লোকে যাকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বলে, উনি তো ঠিক সেই অবস্থায় নেই। উনি আছেন স্বপ্নের জগতে। সেখান থেকে ফেরবার চেষ্টা করলেই আগুন জ্বলে ওঠে। এমনকী আকাশের মেঘও দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। সে কী অপূর্ব দৃশ্য। ওই তো উনি এসে গেছেন, ওঁকেই সব কথা জিজ্ঞেস কর।"

মুখ ফিরিয়েই দিপু ডমরুজিকে দেখতে পেল। তিনি একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখখানি খুব বিষণ্ণ।

দিপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে তিনি কাঁদতে শুরু করে দিলেন। (ক্রমশ)

টিনটিন

রিরিরিং···রিরিরিং
কে ?···ক্যাপ্টেন ? কী খবর ?
প্রথম সুযোগেই এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হবে !
না না, তুমি এখানকার পোকাগুলোর কথা বলছ তো ? এরা কামড়ায় না !
পোকা ? তার মানে ? আমি বলছি ওই··· হ্যাল্লো ! হ্যাল্লো !
ধুত, টেলিফোনে যে আড়ি পাতা হচ্ছে, ক্যাপ্টেনকে তা বোঝাই কী করে?
রিরিরিং··· রিরিরিং···
হ্যাল্লো···হ্যাঁ, লাইন কেটে গিয়েছিল ! পোকা নিয়ে অত ভেবো না !
আর তা ছাড়া,কত যত্নে আমাদের রেখেছেন এঁরা । কত খাতির করছেন । এঁরা অতি ভদ্র, সজ্জন । এদের ছেড়ে চলে যাবার কথাই ওঠে না ।
দ্যাখো টিনটিন, এ-সব কথার মানে কী···
সব রেকর্ড করে রাখছি !
তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারছ না টিনটিন !
এই রে, আবার সেই স্টিকারটা এসে জুটেছে !
ও হ্যাঁ, মনে রেখো, এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ডিনার খেতে নামব !
এক ঘণ্টা বাদে···
ক্যাপ্টেন, এঁদের সম্মানে এক বোতল শ্যাম্পেন খোলা যাক !
এঁদের সম্মানে ! বলছ কী !
উঃ !
আহা রে, ক্যাপ্টেনের বাতের ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে !
বর্ডুরিয়ার শাসক মার্শাল কুর্ভিটাশের জয় হোক !
জয় হোক !
জয় হোক !

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ঢিমে তালে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এই তো কবে যেন নখ কাটলাম, এর মধ্যেই বড় হয়ে গেল ? আমার নখ একটু একটু করে বড় হল, অথচ তা চোখেই পড়েনি। কিছু-কিছু পরিবর্তন এত সময় নিয়ে, এত ঢিমে তালে হয় যে, তার গতিপ্রকৃতিগুলো টেরই পাওয়া যায় না। কেবল ফলাফল দেখে বুঝে নিতে হয় আসলে কোন্ পথে কীভাবে সেই পরিবর্তন ঘটেছে। উদ্ভিদ আর জীবজন্তুদের জাতকুলের যে পরিবর্তন হয়, তা এই ধাঁচের।

দুনিয়ায় যত উদ্ভিদ আর প্রাণী আছে, মিলিয়ে দেখে তাদের দশ লক্ষেরও বেশি ভাগে ভাগ করা যায়। তাদের কারও একশো বছর আগে তোলা ছবির সঙ্গে তাদেরই কারও আজকের তোলা ছবির কোনও তফাত খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাজার হাজার বছর আগে গুহার গায়ে আঁকা হরিণ আর আজকের হরিণের চেহারা হুবহু এক। তুতেনখামেনের কবর খুঁড়ে তিন হাজার বছর আগের যে গমের নমুনা মিলেছে, তার সঙ্গে আজকের গমের কোনও তফাত নেই। কত যুগ পার হয়ে গেছে তবু যে হরিণ সেই হরিণ, যে গম সেই গমই আছে। তাদের এতটুকু বদল হয়নি। আর আরশোলা মহারাজ ? সসাগরা পৃথিবীতে তাঁর রাজত্ব তো তিরিশ কোটি বছর ধরে ! আরশোলারও কোনও পরিবর্তন হয়নি।

এমন অনেকে আছেন যাঁরা পুরনোদের অস্তিত্বের ব্যাপারে হাল ছাড়তে রাজি নন। তাঁরা বলবেন, ওই তো দেখলে জ্যান্ত লাটিমেরিয়া মাছ ! সবাই তো ধরে নিয়েছিল ছ'কোটি বছর আগেই ওরা শেষ হয়ে গেছে। তা হলে ? জ্যান্ত ডাইনোসর আর ম্যামথের খোঁজে তাঁরা তাই এখনও পৃথিবী চষে ফেলছেন।

পরিবর্তনের জালে আজও ধরা পড়েনি এমন পুরনো জীবজন্তু বা উদ্ভিদ এখানে-সেখানে ফাঁকতালে থেকে গেলেও চিরদিন থাকবে না। তা ছাড়া ওদের হিসেবের মধ্যে ধরাটাও ঠিক নয়। কেননা পরিবর্তনের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। সবাই বদলাবে। কেউ দু'দিন আগে, কেউ দু'দিন পরে।

আমাদের চারপাশে যেসব জাতের উদ্ভিদ আর জীবজন্তু আমরা দেখতে পাই, তাদের প্রত্যেকেরই জন্ম আলাদা কোনও জাতের উদ্ভিদ আর জীবজন্তু থেকে। সেই জাতের মধ্যে আপনাআপনি সমানে পরিবর্তন হয়েছে। একেকটা পরিবর্তন ঘটতে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বছর লেগেছে।

আমাদের যদি সিনেমা দেখানোর এমন একটা কল থাকে, যাতে আমরা একেক মিনিটের ছবিতে একেক কোটি বছরকে আঁটাতে পারি, তাহলে তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটা চলচ্চিত্র দেখে ফেলা যায়। চলচ্চিত্রটির নাম হবে : 'এই পৃথিবী, এই জীবন।' (ক্রমশ)

জেনে নাও

মশা কেন রাতে কামড়ায়

মশাকে তো দিনে তেমনভাবে দেখা যায় না। কিন্তু যেই দিনের আলো নিবু-নিবু হয়ে আসে, অমনি পোঁ পোঁ ঘুরে বেড়ানোর শব্দ শোনা যায় ; মশা কামড়াতে শুরু করে।

মশা কেন রাতে কামড়ায় ? রাতের অন্ধকারে মশা দেখে কেমন করে ?

মৌচাক যেমন, মশার চোখও সে রকম, তাকে বলে পুঞ্জাক্ষি। অর্থাৎ অনেক চোখ আছে সেখানে। এর এক-একটাকে বলা হয় ওমাটিডিয়াম। আমাদের চোখের মতন এদের প্রত্যেকটার ভেতরে থাকে অক্ষিপট, বাইরে লেন্স। আলো আসে এক-একটা ওমাটিডিয়ামের ভেতর দিয়ে আর তা প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি করতে পারে।

এই যে ওমাটিডিয়ামগুলি—এর একটা অপরটা থেকে রঞ্জক পদার্থ দিয়ে আলাদা করা থাকে। তাই এক-একটা অক্ষিপটে আলো পড়ে এক-একটা মাত্র লেন্স থেকে। তা অন্যটায় যেতে পারে না। এইভাবে কোনও জিনিসের ছোট ছোট প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়।

তা ছাড়া এক-একটা ওমাটিডিয়ামের মুখ থাকে এক-একদিকে। সেই জন্যে মশা মারার জন্যে কেউ চড় তুললে মশা ব্যাপারটা খুব সহজেই বুঝতে পারে।

কিন্তু আলো যখন কম থাকে তখন মশা দেখে কী করে ? আলো কম হলে রঞ্জক পদার্থ আগের জায়গায় থাকে না। অক্ষিপটের তুলনায় সে ওপরে উঠে আসে। তখন বিভিন্ন ওমাটিডিয়ামের লেন্স থেকে আলো এসে পড়ে ঘাড়ে, আর তা বস্তুর ছবি তৈরি করে। একই জায়গায় এসে পড়ছে বেশি আলো। ফলে অল্প আলোতেও জিনিস বোঝা যায়। কিন্তু যে প্রতিচ্ছবিটা তৈরি হয়, সেটা তেমন পরিষ্কার নয়।

কিন্তু মশার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা রাতেই বেশি কেন ?

কারণ, রাতেই মানুষ বিশ্রাম নেয়। ফলে দিনের বেলায় বিপদ যতটা, রাতে ততটা নয়। আর রাতে যখন মশা দেখতে পায়, তখন নিরাপদ সময় দেখেই তো সে বের হবে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : মাথায় কবিতা আসছে না বলে হরিবাবুর মন খারাপ। বাগানে একটা উটকো লোক দেখতে পান তিনি। লোকটা জানায়, হরিবাবুর স্বর্গত পিতা শিবু হালদার তাকে পাঠিয়েছেন। হরিবাবুকে একটা চাবি দিয়ে লোকটা বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" সে নাকি শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে ঘুমোত। আলপিনের মতো সূক্ষ্ম পিস্তল দিয়ে শিবুবাবু নাকি তিন-তিনটে কালা-সাহেবকে খতম করে বাগানের মধ্যে পুঁতে ফেলেছিলেন। শিবুবাবুর আকাশী জামা পরে শূন্যে ঘোরা যেত। শেষপর্যন্ত ওলন্দাজের হাতে তিনি মারা যান। লোকটা ভূতের গল্প জমিয়েছিল, কিন্তু এই বাড়িতে একটা পাহাড়ি ভূত আছে শুনে সে নিজেই ফ্যাকাসে মেরে যায়। তারপর ···

ন্যাড়া কুস্তিগির বটে, তবে খুব যে সাহসী এমন নয়। কেঁদো কেঁদো চেহারার তার কয়েকজন কুস্তিগির বন্ধু আছে। পিছনের বাগানের একধারে মাটি কুপিয়ে কয়েক টিন তেল ঢেলে মাটি নরম করে হুশ-হাশ শব্দে তারা সেখানে কুস্তি লড়ে। সকলেরই মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। সেইজন্য তাদের বলা হয় ন্যাড়ার দল। সপ্তাহে একদিন গজ পালোয়ান এসে কুস্তির নানারকম কূট কৌশল তাদের শেখায়। গজ পালোয়ান ঠিক পেশাদার কুস্তিগির নয়। একটু সাধু-সাধু ভাব আছে। কৌপীন পরে এবং সারা বছর শীতে গ্রীষ্মে আদুর গায়ে থাকে। ইদানীং মাথায় একটু জট দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্য এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। লম্বা ছিপছিপে গড়ন। বয়সও তেমন বেশি বলে মনে হয় না। তবে মুখে কালো দাড়িগোঁফের জঙ্গল থাকায় বয়স অনুমান করা শক্ত। বছর-দেড়েক আগে শহরের পূর্ব প্রান্তে চক সাহেবের পোড়ো বাংলো বাড়ির উল্টোদিকে রাস্তার ধারে গজ পালোয়ানকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখনও পরনে কৌপীন, পায়ে খড়ম। অচেনা লোককে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে লোকে ধরাধরি করে এনে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সুস্থ হয়ে ওঠার পর পুলিশ তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও পেটের কথা বের করতে পারেনি। গজ পালোয়ান কোথা থেকে এসেছে, কে তাকে ছোরা মারল, এসব এখনও রহস্যাবৃত। তবে সেই থেকে গজ পালোয়ান এই শহরেই রয়ে গেছে। চক সাহেবের বাগানবাড়িতেই তার আস্তানা। সাধু গোছের রহস্যময় লোককে দেখলেই বহু মানুষের ভক্তিভাব দেখা দেয়। গজর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। লোকে অযাচিত হয়ে এসে চালটা ডালটা দিয়ে যায়, প্রণামীও পাওয়া যায় কিছু। সম্ভবত তাইতেই গজ পালোয়ানের চলে যায়।

গজ পালোয়ানের আস্তানায় ক্রমে ছেলে-ছোকরারাও জুটতে শুরু করল। গজ তাদের কাউকে কুস্তি শেখায়, কাউকে লগা বা ছোরা খেলা শেখায়, কাউকে শেখায় ম্যাজিক। যার যেরকম ধাত। ফলে শহরের ছেলে-ছোকরাদের এখন সময় কাটে মন্দ নয়। গজকে গুরুদক্ষিণা হিসেবে তারাও কিছু-কিছু দেয়। ন্যাড়া গজ পালোয়ানের অন্ধ ভক্ত।

ডন বৈঠক, নানারকম ব্যায়াম আর আসন এবং সেই সঙ্গে কুস্তি লড়ে ন্যাড়ার চেহারাটাও হয়েছে পেল্লায়। সারা গায়ে থানা থানা মাংস কে যেন ঘুঁটের মতো চাপড়ে দিয়েছে। কাউকে চেপে ধরলে দম বন্ধ হবে নির্ঘাত। কিন্তু পালোয়ান ন্যাড়াকে বীর বলা যাবে কি-না সন্দেহ। বাড়িতে চোর এলে ন্যাড়ার নাকের ডাক তেজালো হয়ে ওঠে। পাড়ায় মারপিট লাগলে ন্যাড়া মাথাধরার নাম করে বিছানা নেয়।

আজ ছুটির দিন ন্যাড়া সারা সকাল খুব কুস্তি লড়েছে। দুপুরে সেরটাক মাংস, ছ টুকরো মাছ, আধসের পোলাও সাবড়ে উঠে বেশ তৃপ্ত বোধ করে নিজের ঘরে বসে আয়নায়

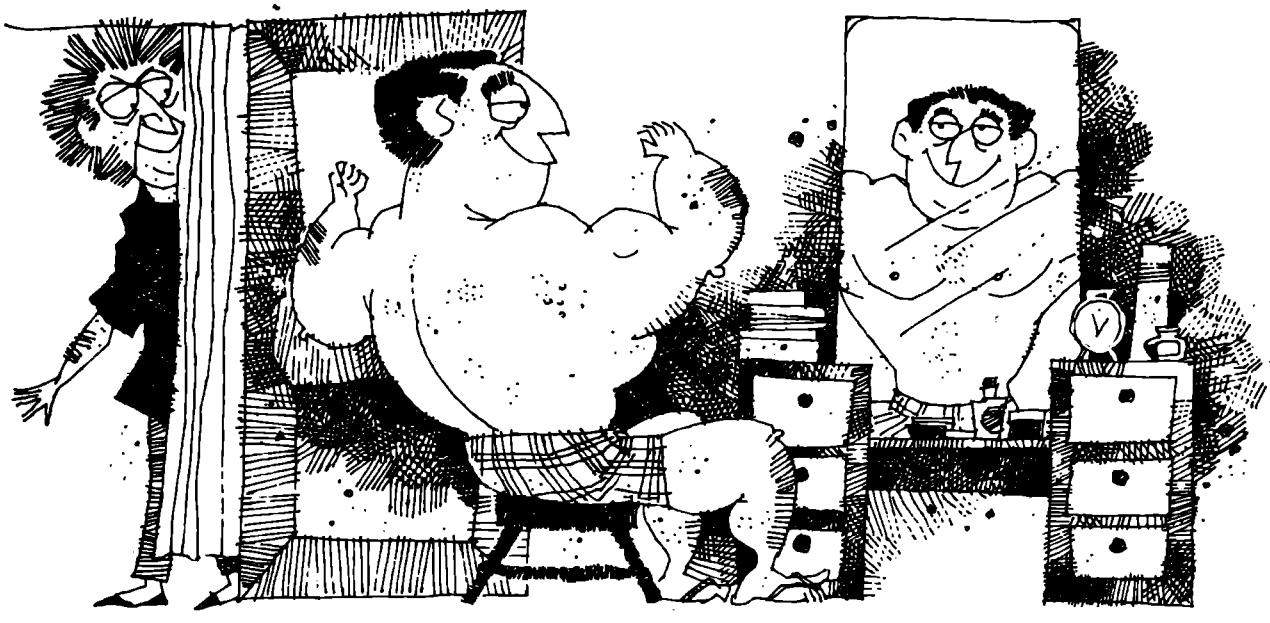

ল্যাটিসমাসের খেলা দেখছিল। হ্যাঁ, তার ল্যাটিসমাস বেশ ভালই। হাত দুখানা তার মুগুরের মতোই মজবুত। একখানা পাথরের চাঁইয়ের মতো বুক। আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে দেখতে ন্যাড়া একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। এত মুগ্ধ যে, ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে যখন একটা লোক নিঃশব্দে ঢুকল তখন সে টেরও পেল না।

লোকটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ন্যাড়ার মাস্‌লের খেলা দেখে আপনমনেই বলে উঠল, "উরে বাস রে, এ যে দেখছি সাতটা বাঘে খেয়ে শেষ করতে পারবে না।"

এমন চমকানো ন্যাড়া বহুকাল চমকায়নি। বুকের ভিতর প্রথমেই তার হৃৎপিণ্ডটা একটা ব্যাঙের মতো লাফ মারল। তারপর একটা লাফের পর ব্যাং যেমন অনেকক্ষণ থেমে থাকে তেমনি থেমে রইল। ন্যাড়ার ঘাড় শক্ত হয়ে গেল, হাত পা অসাড় হয়ে গেল, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল বরফের মতো। গলা দিয়ে দুর্বোধ একটা শব্দ বেরিয়ে এল, 'ঘোঁক! ঘোঁক!'

লোকটা ন্যাড়ার জলে-পড়া মুখচোখ আয়নার ভিতর দিয়ে দেখতে লাগল। তারপর একগাল হেসে বলল, "দিব্যি খেলিয়ে তুলেছেন তো শরীরখানা। একেবারে কোপানো খেত, এখানে-সেখানে চাপড়া উল্টে আছে। আহা, এই গন্ধমাদন দেখলে শিবুবাবু বড় খুশি হতেন।"

ন্যাড়া পলকহীন চোখে আয়নার ভিতর দিয়ে লোকটাকে দেখছিল। আসলে সে দেখতে চাইছিল না। কিন্তু চোখ বুজে ফেলার চেষ্টা করে সে টের পেল, চোখের পাতাও অবশ হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই সে চেয়ে ছিল। এরকম ফটফটে দিনের বেলায় ভূত-প্রেত বা চোর-ডাকাতদের হানা দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে তাতে ভরসারও তো কিছু নেই। এই যে দিব্যি দুপুরবেলা আস্ত একখানা উটকো ভূত তার ঘরে নেমে এসেছে এরই বা কী করা যাবে?

ভূত নাকি খোনা সুরে কথা বলে। কিন্তু এখন ভয়ের চোটে ন্যাড়ার গলা থেকেই খোনা স্বর বেরিয়ে এল, "আঁমার যেঁ বড়ঁ শীত কঁরছেঁ! আঁমি যেঁ কেঁমন ভঁয়-ভঁয় পাঁচ্ছি। ওঁরেঁ বাঁবাঁ রেঁ!"

লোকটা শশব্যস্তে এগিয়ে এসে ন্যাড়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "এঃ, খোকাবাবু, ঠিক সেই ছোট্টবেলাটির মতোই ভয় পাও দেখছি। এঃ মা, দ্বৈপায়নকে ভয় কি খোকা? তোমাকে পিঠে নিয়ে কত ঘুরেছি, মনে নেই? সেই যে যখন এইটুকুন ছিলে, ঝুমঝুমি বাজাতে, মনে নেই?"

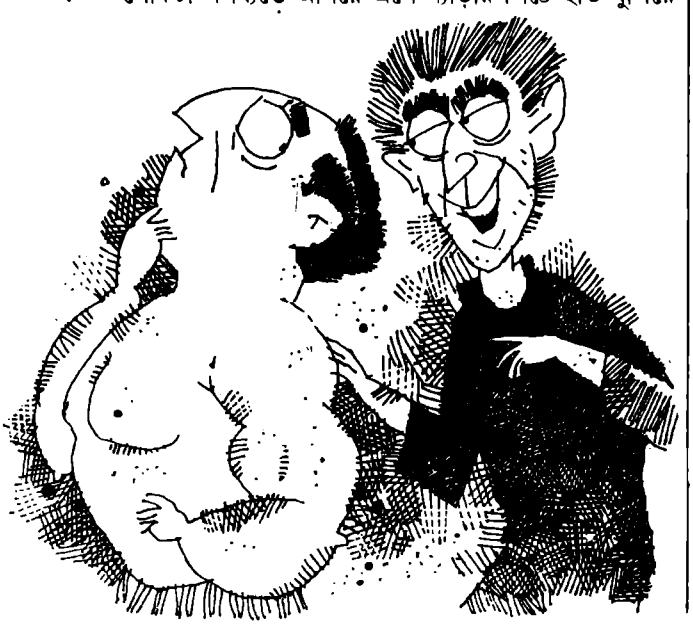

ন্যাড়ার ঘাড় একটু নরম হল। সে লোকটার দিকে হতভম্বের মতো চেয়ে বলল, "আপনি কে?"

লোকটা মাথা চুলকে বলে, "এই তো মুশকিলে ফেললে! লোকে যখন জিজ্ঞেস করে 'আপনি কে', তখনই আমি সবচেয়ে বিপদে পড়ে যাই। আমি লোকটা যে আসলে কে তা আজকাল আমি নিজেই ঠাহর করতে পারি না। তবে শিবুবাবু আমাকে খুব চিনতেন।"

ন্যাড়া বড় একটা শ্বাস ফেলে বলল, "আপনি আমার পিলে চমকে দিয়েছেন।"

লোকটা মাথা চুলকে একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল, "তা চমকানো জিনিসটা ভাল। মাঝে-মাঝে চমকালে মানুষের বাড় খুব তাড়াতাড়ি হয়। গাঁয়ের দেশে দেখবে পুকুরে বেড়াজাল ফেলে মাছ ধরা হয়, তারপর ফের সেগুলোকে জলে ফেলে দেওয়া হয়। ওই যে ধরা হয় তাতে মাছ খুব চমকে গিয়ে তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়ে পেল্লায় সাইজের হয়ে দাঁড়ায়।"

ন্যাড়া নিশ্চিন্ত হয়ে তার ডানহাতের বাইসেপটা বাঁ হাত দিয়ে একটু পরীক্ষা করে নিয়ে বলে, "ঠিক কথা তো?"

"আজ্ঞে চারুদত্তর কথা মিথ্যে হয় খুব কম।"

"চারুদত্ত! সে আবার কে?"

"কেন, আমি! নামটা ভাল নয়?"

"এই যে বললেন আপনার নাম দ্বৈপায়ন!"

"বলেছি? বুড়ো বয়সে মাথাটাই গেছে। আমার ঠাকুর্দারও মাথার দোষ ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে যাকে-তাকে কামড়াতেন। সেই দোষটাই বর্তেছে আমার ওপর। না না, ভয় পেয়ো না খোকা। তোমাকে আমি কামড়াব না। আমার নাম দ্বৈপায়নও বটে, চারুদত্তও বটে। আরও কয়েকটা আছে, সব মনে পড়বে ধীরে ধীরে। তা, বলছিলাম কি, শিবুবাবুর যে ছেলে পুলিশে চাকরি করে, সে কোথায়?"

"সেজদা! সেজদা তো সেই কুমড়োডাঙায়।"

"অনেকটা দূর নাকি?"

"হ্যাঁ, যেতে দেড় দিন লাগে। চারটে খাল পেরোতে হয়।"

"বাঃ বাঃ। খবরটা ভাল। তা খোকা, তোমাদের বন্দুক-টন্দুক নেই? শিবুবাবুর আমলে কিন্তু ছিল।"

"আছে, কিন্তু ব্যাবহার হয় না।"

"খুব ভাল, খুব ভাল। বন্দুক বড় ভাল জিনিসও নয়। ওসব বিদেয় করে দেওয়াই ভাল। তা তুমিই বুঝি কুস্তিগির?"

"হ্যাঁ।"

"বাঃ বেশ। এরকমই চাই। তা সময়মতো দু'একটা প্যাঁচ-ট্যাঁচ শিখিয়ে দেব'খন।"

"আমি গজ পালোয়ানের কাছে শিখি।"

"গজ পালোয়ান! সে আবার কে?"

"ওই যে চক সাহেবের বাড়িতে যার আখড়া।"

কথাটা শুনে লোকটার মুখটা একটু কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

"ভূত বলে কিছু নেই—সব বোগাস !"

ঘরের টানে

কুমার গুপ্ত

ভূত আছে কি নেই এই নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। রোজ যা হয়, লালু যা বলবে অম্বর তাতে আপত্তি করবেই।

আমাদের চার বন্ধুর আড্ডার নির্দিষ্ট জায়গা আছে। শনিবারে হেদোতে। আর রবিবার যে-কোনো বন্ধুর বাড়িতে। আজ শনিবার। হেদোতে আড্ডা বসবার কথা। কিন্তু বিকেলের দিকে প্রচণ্ড মেঘ করে এল। সাড়ে চারটের সময় লালু ফোন করলে। "কী রে, আজ বসবার কী হবে ?" আমি বললুম, "আকাশের যা অবস্থা, তাতে আজ আর হেদোয় বসা যাবে না। তার চাইতে আমার বাড়িতে চলে আয়। আমার এক কাকা এসেছেন। আলাপ করিয়ে দেব, ভাল লাগবে।" লালু বলল, "অম্বর আর রামদার কী হবে ?" আমি বললুম যে, অম্বরকে আমি ফোন করে দিচ্ছি। 'আচ্ছা' বলে লালু ফোন ছেড়ে দিল। তিনবারের চেষ্টায় অম্বরকে ফোনে ধরতে পেরে বললুম, "আজ আমাদের বাড়িতে বসা হবে। তুই রামদাকে খবর দিয়ে দিস।"

তারপর একে একে সবাই আমাদের বৈঠকখানায় জড়ো হয়েছে। আমরা চারজন আর শিবুকাকা। ইতিমধ্যে বার-দুয়েক চা হয়ে গেছে। ছোট বোন ঝুনু এসে বড় এক জামবাটি তেলমাখা মুড়ি বাদাম পাঁপরভাজা আর আলাদা প্লেটে নারকোল-নাড়ু দিয়ে বলে গেল, "এগুলো ধ্বংস করো। তারপর চা দিয়ে যাচ্ছি।"

লালু বললে, "দাঁড়া, মাসিমাকে বলে দিচ্ছি। তোর এতবড় আস্পর্ধা আমাদের খাবার খোঁটা দিস।"

মুখে একগাল মুড়ি ফেলে অম্বর বললে, "যাই বলো, মুড়ি আর পাঁপরভাজা না হলে বর্ষা ঠিক জমে না।"

লালু বললে, "ভূতের গল্প হলে তো কথাই নেই।"

ব্যস, আর যাবে কোথায়। "ভূতের গল্প মানেই যত বাজে গাঁজাখুরি ব্যাপার। নেহাত শিশু আর বোকাদের উপযুক্ত। ভূত বলে কিছু নেই—সব বোগাস," বলে অম্বর ঝাড়া সাড়ে সাতমিনিট বক্তৃতা দিয়ে ফেললে।

লালু একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললে, "হ্যামলেট পড়েছিস ? পড়িসনি। পড়লে জানতিস There are more things in heaven and earth ... "

"মুখস্থ বিদ্যে না ফলিয়ে যদি প্রমাণ দিতে পারিস তো বল।"

"সব জিনিস কি প্রমাণ করা যায় ? এসব অভিজ্ঞতার ব্যাপার। কাউকে দেখানো যায় না।" লালু নিস্পৃহভাবে উত্তর দিলে।

"অভিজ্ঞতা না হাতি। ভূত দেখেছে এমন কাউকে জানিস ? ভূতের গল্প যারা বলে, তারা কেউই স্বচক্ষে দেখেনি। হয় ন-পিসিমার দেওরপোর মেজো মামা কিম্বা গ্রামসুবাদের হারানকাকার শ্বশুর, নাহয় সেজো-জ্যাঠার শালার ভায়রাভাই জাতীয় কেউ দেখেছে। তারা যে ভুল দেখেনি, বা মিছে কথা বলছে না, তার প্রমাণ কী ?" অম্বর ঝাঁঝিয়ে উঠল।

লালু কিছু বলতে যাচ্ছিল। শিবুকাকা ওকে থামিয়ে দিলেন।

"আমি একটা ঘটনার কথা বলতে পারি। বিশ্বাস করা বা না-করা তোমাদের ইচ্ছে। তবে এটা হারানখুড়োর শ্বশুর বা ন-পিসির দেওরপোর মেজোমামা বা সেজোজ্যাঠার ছোট শালার ভায়রাভাইয়ের কাছে শোনা নয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা।" শিবুকাকা অম্বরের দিকে তাকালেন। লালুর মুখে হাসি আর ধরে না।

"ছাত্রজীবনে আমি প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতুম। দেশে তখন ব্রিটিশ শাসন। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে হাজার-হাজার মেয়ে-পুরুষ ছেলেবুড়ো দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ওহ্, সে একটা সময় গেছে। যাক সেকথা, আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। পড়াশোনার ফাঁকে-ফাঁকে যতটুকু দেশের কাজ করা যায় তাই করি। আমার কাজ হল কুরিয়েরের। কাছাকাছির মধ্যে বিভিন্ন ঘাঁটিতে খবর পৌঁছে দেওয়া।

"আমাদের গ্রামে গ্রামসেবকদের নেতা হলেন বুলুদা। শীতকাল। পরীক্ষা হয়ে গেছে। একদিন বুলুদা আমাকে ডেকে বললেন, 'শিবে, তোকে একটা জরুরি কাজ করতে হবে।' 'কী কাজ ?' 'তোকে কাল একবার মলয়পুর যেতে হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তুই তো ফিরতে পারবি না। তোকে রাত্তিরে থাকতে হবে। বাড়ি থেকে পারমিশন পাবি কী করে ? আমার যাবার কথা ছিল। কিন্তু পরশু বর্ধমানে একটা মিটিং আছে। পণ্ডিতজি, সর্দার প্যাটেল, মওলানা সবাই আসবেন। আমাকে সেখানে থাকতেই হবে। কিন্তু এ-ব্যাপারটাও খুবই জরুরি। যাকে-তাকে এ-কাজের ভার দেওয়া যায় না।'

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা.৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্তান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

"অনেকরকম করে তো মায়ের মত করালুম। একটু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হল। তার জন্যে যে মনটা খচখচ করছিল না, তা নয়। তবে মনকে এই বলে প্রবোধ দিলুম যে, আর-এক মায়ের কাজেই তো যাচ্ছি। দেশ তো আমাদের সকলের মা।

"আমাদের আড্ডা ছিল গ্রামের শ্মশানের কাছে একটা বাঁশের ঝোপে। সেখানে গিয়ে দেখি বুলুদা খুব অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। 'শিবে, এসেছিদ ? বাঁচালি।' কোমর থেকে একটা গেঁজে বের করে সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটাতে আড়াই হাজার টাকা আছে। অনাথের হাতে দিবি। আর এই চিঠিটা দিবি, এতে সব কথা লেখা আছে।' আমি গেঁজেটা আর চিঠিটা সাবধানে কোমরে বেঁধে নিয়ে সোজা মলয়পুরের দিকে রওনা হলুম। আমাদের গ্রাম থেকে মলয়পুর দু'ভাবে যাওয়া যায়। বড়রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক ঘুরে যেতে হয়। আর শর্টকাট যেটা, সেটা হল মাঠে-মাঠে। আমার সঙ্গে টাকা ছিল বলে বুলুদা একটা সাইকেল দিয়ে বললেন, 'বড় রাস্তা দিয়ে চলে যা। মাঠ দিয়ে যেতে হবে না।'

"যখন মলয়পুর পৌঁছলুম, তখন তিনটে বাজে। সোজা অনাথদার বাসায় গেলুম। শুনলুম অনাথদা নেই। ফিরতে দেরি হবে। অপেক্ষা করতে হল। অনাথদা ফিরলেন সন্ধের পর। দেখে মনে হল খুব উত্তেজিত। ওঁর মাকে বললেন, 'আমাকে আর শিবুকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাও।'

"খাওয়া হতেই অনাথদা আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আমি থলি আর চিঠিটা দিলুম। নিয়ে অনাথদা বললেন, 'খবর পেয়েছি আজ রাত্তিরে পুলিশ আমার বাড়ি সার্চ করবে। তাই তোমাকে ওখানে রাখলুম না। তোমাকে হবিবুল্লার বাড়িতে রাখব। কোনো অসুবিধে হবে না।'

"আমাকে হবিবুল্লাসাহেবের জিম্মায় রেখে অনাথদা চলে গেলেন। বললেন, 'পুলিশে যদি না অ্যারেস্ট করে তো পরশু বর্ধমানে মিটিঙে যাব। সেখানে বুলুর সঙ্গে কথা হবে।'"

অম্বর বললে, "শিবুকাকার গল্পটি ভাল। কিন্তু ভূত কই ?"

"তুমি তো ভূতে বিশ্বাস করো না। তবে ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? যাই হোক, এখন শোনো। অনাথদা চলে গেলেন। শীতের রাত। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে। আমি বোধহয় বসে-বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হবিবুল্লাসাহেব আমার অবস্থা দেখে আমাকে দোতলার একটা ঘরে শুতে নিয়ে গেলেন। মাঝারি আকারের ঘর। তক্তাপোশের ওপর বিছানা করা ছিল। আমাকে শুয়ে পড়তে বলে হবিবুল্লাসাহেব চলে গেলেন। আমিও দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়লুম। এত ঘুম পেয়েছিল যে, বালিশে মাথা ঠেকাবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লুম।

"কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, বাইরের বারান্দায় কেউ যেন পা টিপে-টিপে হাঁটছে। আমার ভয় হল। মনে হল পুলিশ 'রেড' করেছে। অবশ্য আমার কাছে এমন কোনো কিছু নেই, যার জন্যে পুলিশ আমাকে ধরতে পারে। তবে যদি জিজ্ঞেস করে আমি এখানে কী করছি তা হলে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া শক্ত হবে। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে কাঠ হয়ে শুয়ে রইলুম। আমি যে-ঘরে শুয়েছিলুম পায়ের শব্দটা সেই ঘরের দরজার সামনে এসে থেমে গেল। একবার মনে হল জানালা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করি। তারপরেই মনে হল নামতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি তা হলে পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া একেবারেই অসম্ভব হবে। যা হবার হবে ভেবে আমি বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে রইলুম। আর অপেক্ষা করতে লাগলুম কখন দরজায় ধাক্কা পড়বে। এক মিনিট, দু'মিনিট করে প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল। কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারপর মনে হল কে যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আর তার খানিক পরে দরজার বাইরে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে আবার পা টিপে-টিপে চলে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। পুলিশ নয়। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করলুম। সবে তন্দ্রা এসেছে আর তখনই দরজার কাছে আবার পায়ের শব্দ ও চাপা দীর্ঘনিশ্বাস। হবিবুল্লাসাহেবের কি অনিদ্রারোগ আছে ? মনে হল লোকটি যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকে চলে গেল। মিনিট পনেরো পরে আবার একই ব্যাপার। ইতিমধ্যে আমার একবার বাইরে যাবার প্রয়োজন হল। পায়ের শব্দটা ঘরের কাছে আসতেই আমি উঠে পড়লুম। শোবার সময়ে বাথরুমটা কোথায় জেনে নিইনি। খিল খুলতে খুলতে দরজার বাইরে চাপা নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখি চাঁদের আলোয় বারান্দাটা ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে কেউ কোথাও নেই ... "

শিবুকাকা থামলেন। "তারপর ?" আমরা একসঙ্গে বলে উঠলুম।

"প্রথমে অবশ্য ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। পরে বুঝতে পেরে সেই যে ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিলুম, সূর্য ওঠবার আগে আর খিল খুলিনি। ঘুম তো দূরের কথা, সারারাত বসে রইলুম। তবে তারপরেও বেশ কয়েকবার পা টিপে-টিপে চলার আর চাপা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনেছিলুম। এবং আমার শুনতে ভুল হয়নি।"

রামদা বললে, "কিন্তু ব্যাপারটা কী ?"

"অনেককাল পরে আমি অনাথদাকে ঘটনাটা বলি। অনাথদা আবার হবিবুল্লাসাহেবকে বলেন। হবিবুল্লা অনাথদাকে যা বলেছিলেন, তা হল এই যে ঐ বাড়ি কেনবার পর ঐ ঘরে শুয়ে তিনিও ঐ নিশ্বাসের আর পা টিপে-টিপে হাঁটার শব্দ শোনেন। পাছে বাড়ির মেয়েরা ভয় পায় সেজন্যে তিনি এ-কথা কাউকে বলেননি। কিন্তু খোঁজখবর করে জানেন যে যাঁদের কাছ থেকে বাড়ি কিনেছিলেন, সেই বাড়ির কর্তার ছোটভাই সামান্য অসুখে মাত্র কয়েকদিন ভুগে ঐ ঘরেই মারা যান। ঐ ঘরেই তিনি থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে দরকার হত না বলে ও ঘরে কেউ থাকত না। তার কিছুদিন পরে বাড়ির কর্তাও মারা যান। কর্তার ছেলেরা বাড়ি বিক্রি করে কলকাতা চলে যায়। হবিবুল্লাসাহেব ছেলেদের কাছ থেকে বাড়িটা কেনেন। কিন্তু ঐ ঘরটা কর্তার ভাইয়ের অধিকারেই থেকে যায়। এমনি তো কোনো কিছু গোলমাল নেই। তবে রাত্তিরে কেউ ঘরে শুলেই তিনি ঘরে না ঢুকতে পেরে বাইরের বারান্দায় পায়চারি করেন, আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।"

লালু অম্বরকে খোঁচা দিয়ে বললে, "কী রে, কিছু বল্ ?"

কিছু না বলে অম্বর কটমট করে তাকালে।

ছবি : দেবাশিস দেব

রোভার্সের রয়
এফ. এ. কাপের খেলা। রোভার্স বনাম চকফোর্ড। রোভার্স ০—১ হারছে। প্রত্যেকে উত্তেজিত...
রোভার্স হারছে? বলো কী!
এইমাত্র খবর এল!
খেলার আর মাত্র দশ মিনিট বাকি!
অবিশ্বাস্য!
ভাবা যায় না!
ধ্যাত, বাজে কথা!
রেডিয়োর খবর, রোভার্স হারছে!
রোভার্স হারতে পারে না!
ওদিকে চলছে খেলা...
উঃ!
মার্ভিনকে ফাউল করেছে!
আবার ফ্রি-কিক!
প্যাকো ডিয়াজ বাঁকানো শট নিল...কিন্তু...
নাও ভার্নন!
পোস্টে লেগে ফিরছে!
উঃ!
কিন্তু...
বাইরে পাঠাল!
কর্নার!
ভালই করেছে!
বদলি-খেলোয়াড় নামবে...
CHALK
কাকে নামাবে রোভার্স?
রয় নিজে নামবে না কি?
জেরিকে বসিয়ে নোয়েলকে নামাচ্ছে রয়...
বল নিয়ে হরিণের মতো ছুটবে!
বাস. তারপরেই ঢুকবে ভিতরে!
ঠিক আছে!

রোভার্স কি লিগ-চ্যাম্পিয়ান হতে পারবে ?

অর্থ জানো

মেহমান মহফিল…

মনে করো, আবু হোসেনের মতো তুমি রাতারাতি বাদশা বনে গেছ। কিন্তু বাদশাহি আমলের নানা কথার অর্থ তুমি জানো কি ? নীচের শব্দগুলি ওই শ্রেণীর, আর আমরা তা প্রায়ই বইয়ে পড়ি বা ব্যবহার করে থাকি। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

(১) **মেহমান**—(ক) মহৎ। (খ) অতিথি। (গ) উপকারী। (ঘ) সম্মাননীয় ব্যক্তি

(২) **কিংখাব**—(ক) দামি কাপড়। (খ) ফুলকাটা জরিদার রেশমি বস্ত্র। (গ) মসলিন। (ঘ) রঙিন রেশমি বস্ত্র।

(৩) **রঙমহল**—(ক) রঙিন কাচ লাগানো মহল। (খ) মণিরত্নখচিত মহল। (গ) বাইরের মহল। (ঘ) নবাব-বাদশার বিলাসভবন বা অন্তঃপুর।

(৪) **মহফিল**—(ক) সভা। (খ) গান-বাজনা। (গ) নাচের জলসা। (ঘ) রাত্রিবেলার জলসা।

(৫) **দেওয়ান-ই-আম**—(ক) গুপ্ত রাজসভা। (খ) যে রাজসভায় কারও প্রবেশের অধিকার নেই। (গ) ক্ষুদ্র রাজসভা। (ঘ) সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাজ-দরবার।

উত্তর : ১। মেহমান—(খ) অতিথি। যেমন—এ গরিবখানায় আপনি আমার মেহমান।

২। কিংখাব—(খ) ফুলকাটা জরিদার রেশমি বস্ত্র। যেমন—'সোনারুপোর জরি দিয়ে সে কিংখাবে কারুকার্য করা হয়েছে' (সৈয়দ মুজতবা আলি)।

৩। রঙমহল—(ঘ) নবাব-বাদশার বিলাসভবন বা অন্তঃপুর। ফার্সি রঙ শব্দের অর্থ আনন্দ, মহল অর্থ ঘর বা বাড়ি। যেমন—'জেবউন্নিসা রঙমহলের সর্বকর্ত্রী ছিলেন' (বঙ্কিমচন্দ্র)।

৪। মহফিল—(ক) সভা। এই ফার্সি শব্দটির বিকৃত উচ্চারণ হল 'মাইফেল', আর তার মূল অর্থ থেকে সরে আজকাল অর্থ করা হয় গানবাজনার আসর।

৫। দেওয়ান-ই-আম—(ঘ) সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাজ-দরবার। ফার্সি 'আম' শব্দের অর্থ সাধারণ। 'ই' যুক্ত অর্থে সাধারণের। 'দেওয়ান' শব্দের অর্থ রাজসভা।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

শীতের সকালে হঠাৎ

সেদিন রবিবার। সকাল হতে না হতে চম্বলের বন্ধু রাখালরাজ তার সাইকেল নিয়ে এসে হাজির।

Chambal had just finished his breakfast. He was looking out of the window.

The clear blue sky, the brilliant sunshine seemed to invite everybody to come out into the open.

"I'm not going to waste a morning like this, am I?" Chambal was thinking. "Such mornings were not made for staying indoors."

But it's not much fun going out on a holiday-trip all by yourself. Father had settled down for the morning with a book. It would not be easy to get him to leave his chair. Mother was in a hurry to finish the cardigan she was knitting for Father.

"It wouldn't be much use, would it, when winter is over?" she'd sometimes say.

And Milly? Chambal didn't suppose Milly would have much fun doing the things Chambal liked to do. Girls are different, you know.

So, there was Chambal, wishing he had somebody to go out with.

It was just then that Rakhalraj turned up.

He seemed in a great hurry.

"Come on, Chambal," he said, "what are you waiting for? Take out your bi-cycle. We have a long way to go."

"Where to?" Chambal asked.

"I'll tell you all about that when we're on our way." Rakhalraj replied.

Chambal didn't ask any more questions. There wasn't much point, was there, in doing so? What did Chambal care where they were going so long as they were going somewhere?

But just as Chambal was taking out his bi-cycle, Daddy looked up from his book.

"Where are you off to?" he asked.

"I don't know, Daddy."

"You don't know? How do you mean, you don't know? You have some idea where you're going, haven't you? Yours is not going to be a journey to the unknown, is it?"

A journey to the unknown!

"What an exciting idea!" Chambal thought.

He got ready in a few minutes.

Rakhalraj was waiting outside. Chambal said, "Let's go now, shall we?"

এবারে লক্ষ করো, সাধারণ বাক্যের সঙ্গে প্রশ্নবোধক বাক্যাংশ দিয়ে কেমন করে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করা যায় :

I'm not going to waste a morning like this, am I?

You have some idea where you're going, haven't you?

Yours is not going to be a journey to the unknown, is it?

It wouldn't be much use, would it, when winter is over?

There wasn't much point, was there, in doing so?

সাধারণ বাক্যকে বলার ভঙ্গিতে প্রশ্নবোধক করা যায়— :

I don't know, Daddy.

You don't know?

প্রসাদ

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

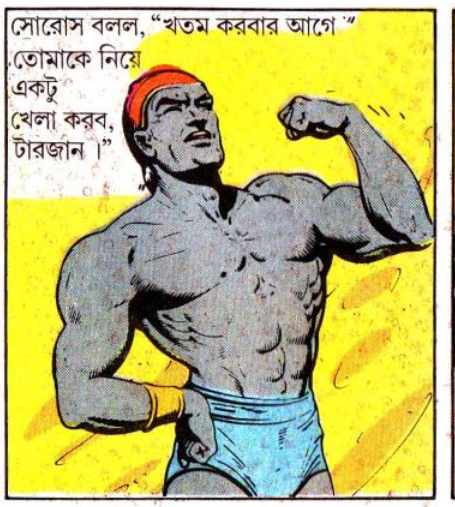

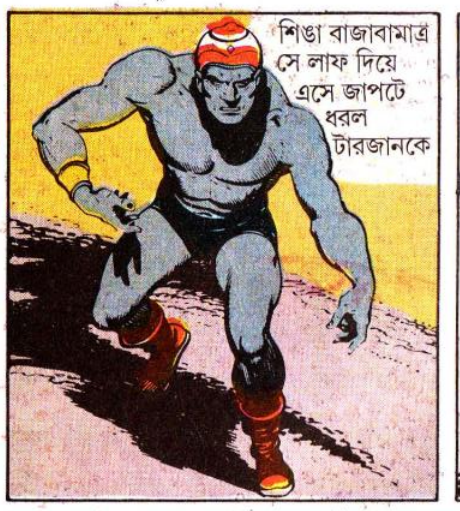

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধাঁধা

শীতকালে এই আরেক মজা। পরীক্ষা হয়ে যায়। নতুন ক্লাসের পড়াশুনা শুরু হতে হতে এসে যায় সরস্বতীপুজো। স্কুলের স্পোর্টস, বার্ষিক সম্মিলনী এসবও এই সময়। ফলে চাপটা কম থাকে পড়াশুনোর।

কেন জানি না, বড়দেরও মন-মেজাজ বেশ ভাল থাকে এই সময়টা। কেউ সার্কাসে যাবার টিকিট কিনে আনছে। কেউ-কেউ নিয়ে যাচ্ছে চিড়িয়াখানায়, কেউ বা জাদুঘরে কিংবা বোটানিক্যাল গার্ডেনে। এখন আবার নতুন মজার মধ্যে যোগ হয়েছে ঝিলমিল ও বিধান শিশু উদ্যান। ছোট্কা অবশ্য আগের বছরই ঝিলমিল ঘুরিয়ে এনেছিল আমাদের। এবার তাই আমরা যখন ছোট্কাকে সবাই মিলে ধরলাম, ছোট্কা বলল, তাহলে এবার বরং আমরা কলকাতার লেটেস্ট আকর্ষণ উপভোগ করি। চলো একদিন চড়ে আসি পাতাল-রেল আর চক্ররেল।

সত্যি, এ-দুটো যে কলকাতার নতুন আকর্ষণ, পরীক্ষার চাপে তা বোধহয় ভুলেই ছিলাম। তাই, ছোট্কার কথায় লাফিয়ে উঠলাম আমরা।

আর, সে যে কী সুন্দর অভিজ্ঞতা হল, কী বলব। অবশ্য

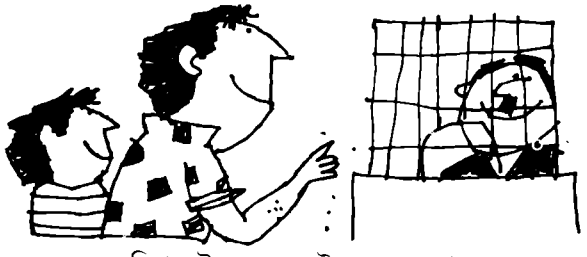

বলতে কেন, লিখতেই হবে। ছোট্কা আবার প্রত্যেককে কাজ দিয়েছে—এবারের অভিজ্ঞতা লিখে ফেলে দেখাতে হবে ছোট্কাকে। প্রত্যেকবারই অবশ্য দেয়।

তবে চক্ররেলে বসে ছোট্কার বলা ধাঁধাটাও বেশ মজার। শুনবে কী ধাঁধা? বেশ, সেটা দিয়েই শুরু হোক।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটি ছোটখাটো রেলপথ। মোট ২০টি রেলস্টেশন সেই রেলপথে। প্রতি স্টেশনেই প্রতিটি গাড়ি থামে। তা, এই রেলপথে সব মিলিয়ে কত ধরনের টিকিট লাগবে বলতে পারো, যাতে কিনা প্রতিটি স্টেশনে আপ-ডাউন মিলিয়ে প্রতিটি জায়গার জন্য আলাদা টিকিট চাইলেই পাওয়া যায়?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ পরের সংখ্যাগুলো কী কী হবে আন্দাজ করো তো?

৫, ১৭, ৩৭, ৬৫, ..., ...

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

পচনলোপশদ্মলা

গতবারের উত্তর ॥ (১) (ক) Automobile (খ) Oxygen (গ) Saxophone. (২) Therein: the, there, he, her, here, ere, rein, in. (৩) পলিতকেশ।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১	২		■	৩	৪	
■		■		■		■
৫		৬	■	৭		৮
	■	৯			■	
১০	১১		■	১২	১৩	
■		■		■		■
১৪			■	১৫		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ভ্রমর। (৩) গায়ে বড়-বড় কাঁটা, যেন চলমান ঝাঁটা। (৫) নিদর্শন। (৭) গানের দোসর। (৯) পুরাণে ও রূপকথায় বর্ণিত নরখাদক। (১০) গণিতের একটি অংশ। (১২) মেটে রঙ। (১৪) জল। (১৫) কুড়ুল।

উপর-নীচ : (২) নক্ষত্রবিশেষ। (৪) জলযান। (৫) সন্ন্যাসীর ভ্রমণ। (৬) কাঠ-চেরা যার পেশা। (৭) ঔষধি-বিশেষ। (৮) অভিযোগ। (১১) বন্ধুতা। (১৩) খাঁচা।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

চ	ড়	ক	■	চ	ত্তু	র
ক	■	চি	কু	র	■	ক
ম	ক্কা	■	চ	■	শা	মা
কি	■	মা	কা	ল	■	রি
■	নো	■	ও	■	কা	■
■	ল	ও	য়া	জি	ম	■
টা	ক	■	জ	■	লা	ক্ষা

মজার খেলা

এবারে যে-মজার খেলাটা শিখব আমরা, তার জন্য কোনো উপকরণই যোগাড় করতে হবে না। শুধু কাগজ-পেন্সিল আর বন্ধু হলেই যথেষ্ট। আর, এ তো আছেই।

ব্যাপারটা হল, বন্ধুদের সামনে নীচের ছকের মতো একটা ছক কাগজে এঁকে দাও—

	?	

ছকটার ঠিক মাঝের খোপে থাকবে একটা প্রশ্নের চিহ্ন। কেননা, ও-খোপটায় অন্য কিছু বসবে না।

এবার কোনো বন্ধুকে বলো, ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে এমনভাবে এই ছকটার খোপে খোপে বসাতে হবে, যাতে কিনা, এক-একটা বাহুর যোগফল হয় ২০। হ্যাঁ, যে-কোনো দিকের বাহুরই যোগফল হবে ২০।

তেমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। বন্ধুরা কেউ-কেউ পেরে যাবে, কেউ-কেউ পারবে না। এটার মধ্যে তো চালাকি নেই, শুধু নির্দোষ মজা দিয়ে সময় কাটানোর খেলা। নিজেরা চেষ্টা করো। আমিও একটা উত্তর দিয়ে দিই বরং, তাহলে অন্তত যারা পারবে না, তাদের সুবিধে হবে—

৭	৩	১০
৮	?	৪
৫	৯	৬

কী, তোমাদেরও এই উত্তরই হয়েছে? হবেই। হাজার হোক, অঙ্ক তো।

মজারু

হাসিখুশি

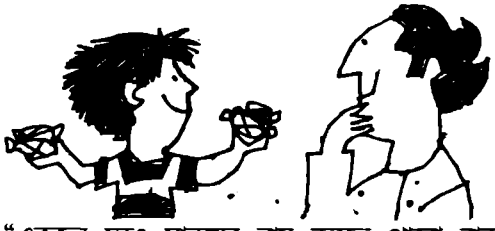

"একজন মহৎ মানুষের নাম বলতে পারো বাবুয়া?"

"পারি স্যার। আমার বাবা।"

"কেন বলো তো?"

"উনি আমাকে রোজ চিকলেট কেনার পয়সা দেন।"

"আমি যদি কোনোদিন রাজা হই, তোকে ঠিক মন্ত্রী করে দেব।"

"তার আগে তোর কাছে যে-পঞ্চাশ টাকা পাই, সেটা শোধ দিয়ে দিস।"

"গত সপ্তাহে যে-বইটা পড়তে নিয়েছিলাম, ওটা আর একবার দেবেন?"

"বইটা খুব ভাল লেগেছে বুঝি?"

"না। পাওনাদারকে কীভাবে ফাঁকি দেওয়া যায়, তার ছকটা বইয়ের মধ্যেই ভুল করে রেখে দিয়েছি।"

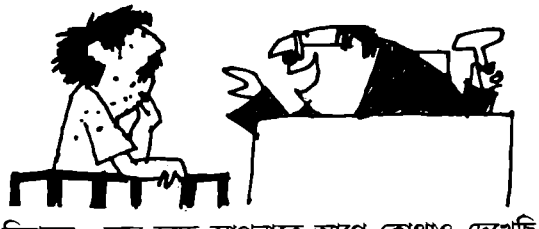

বিচারক : মনে হচ্ছে আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি।

আসামি : আমি আপনার মেয়েকে গান শেখাতাম।

বিচারক : তাই নাকি। তাহলে তো আপনার শাস্তিটা আরও দশ বছর বাড়িয়ে দিতে হয়।

"ওয়েস্ট ইণ্ডিজে কী সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় বলো তো তাতাই?"

"জানি না, স্যার।"

"চিনি কোথা থেকে পাই আমরা?"

"আমরা তো প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার নিই।"

বিচারক : এর আগে চুরির দায়ে কতবার কোর্টে এসেছ?

আসামি : কী করে বলব হুজুর? সেটা তো আপনারই গুনে রাখবার কথা।

"তুমি যদি শহিদ মিনারের চুড়ো থেকে নীচে লাফ দিতে পারো, তোমাকে এক লাখ টাকা দেব।"

"আগে একবার লাফ দিয়ে তুমি দেখিয়ে দাও। তাহলে ওই টাকার অর্ধেক তোমার।"

ছবি : দেবাশিস দেব

ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট করেছে আয়োজন, শীতে উষ্ণ-মধুরতায় ভরাবে সবার শরীর-মন

চকোলেট সিজ্‌ল !

এক কাপ ফুটন্ত গরম দুধে তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট মেশান আর সবাইকে খাওয়ান—ধোঁয়া ওঠা চকোলেট সিজল কনকনে শীতে, শরীরকে চাঙ্গা রাখার এক মধুর উপায় !

চকোলেট সুঅর্ল !

বেশ খানিকটা গরম দুধে তিন চা-চামচা ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট মিশিয়ে দিন—ওপর থেকে দিন মধু ছড়িয়ে ! এ এক মধুর চকোলেট সুঅর্ল শীতের দিনের সাদর-আহ্বান, ভরিয়ে তোলে উষ্ণতায় দেহ-মন-প্রাণ।

চকোলেট নাটি !

গরম ধোঁয়া ওঠা এক কাপ দুধে তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট মিশিয়ে দিন। কুচো-বাদাম ছড়িয়ে দিন ওপরে ! চমৎকার চকোলেট নার্টি ! উষ্ণ-মধুর চকোলেট মজাদার—ঘরের পানে টানে বারবার !

চকোলেট স্পাইস !

একমগ গরম দুধে তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট দিন মিশিয়ে ! দারুচিনি, জায়ফল ও এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে নেড়ে দিন—এ এক তাক্ লাগানো চকোলেট স্পাইস ! শীতের দিনে দেহ-মনে এনে দেয় উষ্ণতার অনুরণন !

ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট ২০০ গ্রামের টিনেও পাওয়া যায় !

OBM/3323 BEN

(সম্পূর্ণ উপন্যাসের প্রথমাংশ)

সাত বিলিতি হেরে গেল

শেখর বসু

স্কুল থেকে ফিরে কোনোমতে খাওয়াদাওয়া সেরেই টিঙ্কু আমবাগানে ছোটে। শীতের শুরু, আমগাছে একটাও আম নেই, কিন্তু ওর বয়সী বেশ কয়েকটা ছেলে রোজ বিকেল হতে না হতেই আমবাগানে এসে জড়ো হয়। সবার চোখ থাকে বাগানের ওপাশের লাল বাংলোটার দিকে। প্রতিদিন এই সময় ওই বাংলো থেকে বেরিয়ে বাগানে বেড়াতে আসে সাহেব। ঘণ্টাদেড়েক বেড়ায়। ওই সময়টুকু কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে সাহেবের পেছন-পেছন ঘোরে এই ছেলের দলটা। সাহেব আবার বাংলোয় ফিরে গেলে দলটাও ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়।

এরা কিন্তু কেউই সাহেবের জন্যে আসে না, সাহেবের সঙ্গে যারা আসে তাদের দিকেই এদের চোখ থাকে সবসময়। তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে এদের চোখ গোল-গোল হয়ে ওঠে, কখনও তারিফ করার জন্যে হাততালি দেয় একসঙ্গে। কিন্তু যাদের জন্যে এত হাততালি তারা একবার ফিরেও তাকায় না। সাহেব তাকায়, তাকিয়ে মাথা সামান্য নিচু করে এমনভাবে হাসে যেন হাততালিগুলো ওরই পাওনা। তারপরেই জোরালো একটা শিস দিয়ে সঙ্গীদের বলে, নাও গো অ্যাণ্ড প্লে।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় সাতটা কুকুরের অদ্ভুত সব খেলা। কেউ তীরের মতো ছুটে আমবাগানে গোটাকয়েক চক্কর দেয়। কেউ ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খায়। কেউ আমগাছের নিচু, শোয়ানো ডাল বেয়ে কিছুটা ওপরে উঠে পড়ে। কেউ-কেউ নিজেদের মধ্যে মিথ্যে-মিথ্যে মারামারি করে। এই খেলা চলে মিনিট পনেরো-কুড়ি। তারপর সাহেব আর একটা শিস দিতেই কুকুরগুলো বাধ্য ছেলের মতো সাহেবের দুপাশে এসে দাঁড়ায়। এপাশে চারটে, ওপাশে তিনটে। সাহেবের সঙ্গে পা মিলিয়ে হেঁটে-হেঁটে ওরা ঢুকে যায়

বাংলোর মধ্যে।

কুকুরগুলোকে দেখে প্রতিদিন নতুন করে অবাক হয় টিঙ্কু। কী করে ওরা ঠিক মানুষের মতো চলাফেরা করে! মানুষের মতো কথা শোনে! বন্ধুদের, বাড়ির সবাইকে এই নিয়ে ও কত প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কেউ ওর মনের মতো উত্তর দিতে পারেনি।

টিঙ্কুরা থাকে উত্তরপ্রদেশের ছোট্ট একটা আধা-শহর ইমতিয়ারপুরে। এখানকার মিশনারি স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে ও। ওদের বাড়ির সামনের দিকে বিশাল এক আমবাগান, বাকি তিনদিকে খেত। খেতের মাঝখান দিয়ে পথ চলে গিয়েছে দূরের ওই পাহাড়ের দিকে। শান্ত এলাকা। বছরে একবার শুধু এখানে একটা মেলা বসে, আর আসে একটা সার্কাসের দল। কিন্তু সার্কাসের ওই জন্তু-জানোয়ারগুলোর চাইতে হাজারগুণ বেশি বুদ্ধিমান সাহেবের এই কুকুরগুলো। কদ্দিন স্বপ্নের মধ্যে কুকুরগুলোর সঙ্গে খেলা করেছে টিঙ্কু।

সাহেব কোথায় থাকে কেউ জানে না, কিন্তু প্রতি বছর শীতের শুরুতে কুকুরগুলো সঙ্গে নিয়ে ওই বাংলোয় এসে ওঠে। মাস-তিনেক এখানে থাকার পরে আবার কোথায় যেন চলে যায়। তবে ওই তিন মাস বিকেল হতে না হতেই আমবাগানে ভিড় জমে যায় ছোটদের। প্রতিদিন নতুন-নতুন খেলা দেখায় কুকুরগুলো। এক-একটা খেলা শেষ হলেই সাহেব ওদের পিঠ চাপড়ে, ঘন লোমের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে আদর করে। বারবার। আদর পেলেই কুকুরগুলো ওদের ফুলঝাড়ুর মতো লেজ নেড়ে মাটিতে পড়ে-থাকা শুকনো আমপাতা পরিষ্কার করে। ওদের আদর খাওয়ার ভঙ্গিগুলোও বেশ মজার। ঝাঁকড়া লোমওয়ালা ছোট্ট কুকুরটাকে আদর করলেই ও চিত হয়ে শুয়ে শূন্যে তুলে দেয় চার পা। টিঙ্কুরও খুব ইচ্ছে করে ওকে একটু আদর করতে, কিন্তু কাছে এগোবে কে! সাতটা কুকুরের একটাকে দেখতে ঠিক বাঘের মতো। বিশাল চেহারা, আর চোখদুটো টকটকে লাল। ও রেগে গিয়ে একটা কামড় বসালে আর দেখতে হবে না!

সেদিন শনিবার। টিঙ্কু একটু তাড়াতাড়িই আমবাগানে চলে এসেছিল। ও আসার পরে এক-এক করে অন্য ছেলেরাও হাজির হল। কিন্তু সাহেব আর আসে না! কেন আসছে না? আসার সময় তো পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ! সাহেব তো কক্ষনো দেরি করে না! লাল বাংলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওদের চোখ টনটন করে উঠল, কিন্তু সাহেবের আর দেখা পাওয়া গেল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হওয়ার মুখে টিঙ্কু ছাড়া আর সবাই চলে গেল এক-এক করে।

বেড়াতে না আসার জন্যে টিঙ্কুর খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল সাহেবের ওপর। এখন মনে হল—আচ্ছা, সাহেবের জ্বর-টর হয়নি তো! কিম্বা সাহেব হয়তো ভালই আছে, অসুখ করেছে কুকুরের! আবছা আলোয় আমবাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সেই অসুস্থ কুকুরটার জন্যে ভীষণ মন কেমন করে উঠল টিঙ্কুর। ও আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেল বাংলোর দিকে। বাংলোর সামনে একটা বাগান, বাগানে কেউ নেই। বাংলোর দরজা-জানলাও বন্ধ, সাহেব কি তাহলে অন্য কোথাও চলে গেছে!

ফিরে যাওয়ার মুখে টিঙ্কুর মনে হল, বাংলোর পেছনদিকেও তো একটা বাগান আছে, ওই বাগানটা একবার দেখে গেলে কেমন হয়! নিচু মাপের পাঁচিল দিয়ে বিশাল বাংলোটা ঘেরা। পেছনের বাগানের গেটের সামনে আসতেই টিঙ্কুর বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠল ধক্ করে। ওই তো সাহেব!

গেটের কাছেই একটা বেতের চেয়ারের ওপর সাহেব বসে আছে। ওর চারদিকে কুকুরগুলো। টিঙ্কু পায়ে পায়ে বন্ধ গেটের কাছে আসতেই সাহেব দেখতে পেল ওকে। চোখে চোখ পড়তে সাহেব একটু হাসল, তারপর হাত নেড়ে বলল, "কাম ইন্।"

বাগানের ভেতরে ঢুকতে টিঙ্কুর খুব ইচ্ছে করছিল, কিন্তু কুকুরগুলো যদি ওকে কামড়ে দেয়! সাহেব বোধহয় ওর মনের কথা ধরতে পেরেছিল, হাসতে হাসতে পরিষ্কার বাংলায় বলল, "ভয় নেই, আমার কুকুররা তোমাকে কামড়াবে না।" তারপর সবচেয়ে বড় কুকুরটার দিকে তাকিয়ে বলল, "অ্যান, আনলক দ্য গেট।"

অবাক কাণ্ড! বড় কুকুরটা ছুটে এসে মুখ দিয়ে গেটের আড়াআড়ি খিলটা খুলে দিল। তাই দেখে টিঙ্কুর বড়-বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে গেল। অ্যানের চেহারা ঠিক বাঘের মতো, কিন্তু স্বভাবটা কী মিষ্টি! ওকে একবার শুঁকে নিয়েই লেজ নাড়তে লাগল। টিঙ্কু জানে, কুকুররা খুশি হলে লেজ নাড়ে। তার মানে অ্যান ওকে দেখে খুশি হয়েছে। ওর বুক ঢিবঢিব করছিল, কিন্তু জোর করে মনে সাহস এনে সাহেবের সামনে এসে দাঁড়াল।

সাহেব বেশ মজার-মজার কথা বলতে পারে। দু'চার মিনিটের মধ্যে সাহেবের সঙ্গে টিঙ্কুর খুব ভাব হয়ে গেল। সাহেবের নাম পিটার। নানা কথার পরে সাহেবকে টিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "তুমি আজকে আমবাগানে বেড়াতে গেলে না কেন?"

সাহেব বলল, "এখন থেকে আমি ভোরে বেড়াব। বিকেলে বেশ গরম। তা, তুমিও চলে এসো না, ভোরবেলায় একসঙ্গে বেড়াব।"

টিঙ্কুর মুখ শুকনো হল; "আমি যে ভোরবেলায় মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে যাই।"

তাই শুনে সাহেব ওর পিঠ চাপড়ে বলল, "ঠিক আছে, তুমি তাহলে রোজ বিকেলে আমার বাংলোয় চলে এসো। আমি তোমাকে কুকুরদের গল্প শোনাব।"

অনেকক্ষণ ধরে টিঙ্কুর মুখের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল, সাহস পেয়ে ও এবার প্রশ্নটা করেই ফেলল, "কুকুরকে ট্রেনিং দেওয়ার কায়দাগুলো আমাকে শিখিয়ে দেবে তুমি?"

সাহেব চোখ কপালে তুলে বলল, "সে খুব কঠিন কাজ। তুমি ছেলেমানুষ, ওসব পারবে না। আমরা তিন পুরুষের প্রোফেশনাল ডগ-ট্রেনার। আমি ছিলাম দিল্লি কেনেল ক্লাবে, আমার বাবা ছিলেন রেঙ্গুন কেনেল ক্লাবে, আর আমার ঠাকুর্দা ছিলেন জার্মানির ডগ-ট্রেনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। কুকুরদের মানুষ করতে গিয়ে আমাদের কত কষ্ট পেতে হয়েছে। তবে আমি এ-কথা বলছি না যে, তুমি কখনোই ডগ ট্রেন করতে পারবে না। পারবে, তবে তার জন্যে তোমাকেই ট্রেনিং নিতে হবে বেশ কয়েক বছর।"

"আমাকে ট্রেনিং নিতে হবে?"

"বাহ্! ট্রেনিং না নিলে কি ট্রেনার হওয়া যায়? ডগ

ট্রেনিংয়ের প্রথম কথাই হল ডগ সাইকোলজি বোঝা।"

"কী লজি ?"

টিঙ্কুর প্রশ্নে সাহেব সস্নেহে হেসে বলল, "বললাম-না ডগ ট্রেনিং খুব কঠিন সাবজেক্ট। ডগ সাইকোলজি মানে কুকুরের মন বুঝতে হবে সবার আগে। সব মানুষ যেমন সমান হয় না, সেইরকম সব কুকুরও সমান হয় না। কেউ রাগী, কেউ ভিতু, কেউ চালাক, কেউ বোকা, কেউ শান্ত, কারও আবার বায়না করা স্বভাব। মানুষদের যেমন চাইল্ডহুড, কুকুরদের তেমনি পাপিহুড। বাচ্চা কুকুরের মন বুঝতে হবে সবার আগে। তার জন্যে কী-কী দরকার জানো ?"

"কী-কী ?" ভাল ছাত্রের মতো জিজ্ঞেস করল টিঙ্কু।

সাহেব হাতে পাইপ নিয়ে টেবিলের ওপর কী যেন খুঁজে সাদা উলের বলের মতো কুকুরটার দিকে তাকিয়ে বলল, "জুলি, ব্রিং মাই টোব্যাকো।"

অমনি জুলি লাফিয়ে-লাফিয়ে ঘরে ঢুকে গেল : একটু পরেই ফিরে এল ছোট্ট একটা চামড়ার প্যাকেট মুখে নিয়ে তামাকের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে জুলিকে আদর করল সাহেব তারপর পাইপ ধরিয়ে বলল, "মানুষের মতো কুকুরও অ্যাপ্রিসিয়েশন চায়। কুকুর তোমার কথা শুনলেই কুকুরকে আদর করবে। এই যেমন আমি করলাম। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কুকুরের মন বুঝতে গেলে প্রথমেই দরকার অবজার্ভেশন। তোমাকে খুব ভাল করে লক্ষ করতে হবে কুকুরের ঝোঁক কোন্ দিকে, সে কী ভালবাসে। এসব বুঝতে গেলে ধৈর্য দরকার, অসীম ধৈর্য। আসলে পেশেন্স ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাণ্ড লাস্ট ওয়ার্ড ইন ডগ ট্রেনিং। মাথা গরম করলে তুমি কক্ষনো ডগ ট্রেনার হতে পারবে না। কুকুরের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশবে, ভালবাসবে। বেশি শাসন করলে কুকুর কিন্তু বিগড়ে যায়। ট্রেনিং দেওয়ার সময় কুকুরকে একদম মারধোর করবে না। শোয়িং স্টিকস ইজ নো গুড। তুমিই বলো না, যে-সব মাস্টারমশাই মারধোর করেন, তাদের কাছে পড়াশুনো করতে ভাল লাগে তোমাদের ?"

"না, একদম না।" চটপট উত্তর দিল টিঙ্কু।

"তবে ছাত্রকেও ভাল হতে হবে। যে-কোনো কুকুরকে তো আর সব কিছু শেখানো-পড়ানো যায় না। আমার কাছে যে কুকুরগুলো আছে তারা সবাই ভাল বংশের। যেমন—লেব্রেডর, বুল মাসটিফ্, আইরিশ উল্ফ হাউণ্ড, ফক্স টেরিয়ার, সিডনি সিল্কি, ককার আর স্পেনিয়াল। আমার একটা গোল্ডেন রিট্রিভারও আছে। বেচারা এখন দিল্লির নার্সিং-হোমে, ওর একটা মাইনর অপারেশন হবে।"

"কুকুর নার্সিং-হোমে ?"

"বাহ ! মানুষ নার্সিং-হোমে থাকতে পারে, আর কুকুর পারে না?" সাহেব একটু চটে গিয়ে উত্তর দিল।

সাহেবকে হঠাৎ চটে যেতে দেখে টিঙ্কু বেশ দমে গেল। এক্ষুনি কিছু একটা বলা দরকার, কিন্তু কী বলবে ভেবে পেল না কিছুতেই। একটু পরে মিনমিন করে বলল, "স্যার, আই লাভ ডগস।"

কথাটা শুনে হাসি ফুটল সাহেবের মুখে। হাসিটা আরও বড় করে সাহেব বলল, "দ্যাট'স গুড। ইউ নো, আই অ্যাম বাই নেচার এ ডগ লাভার দে আর পার্ট অব মাই ফ্যামিলি। কুকুরদের নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে আমার খুব খারাপ লাগে। তোমার যদি কুকুর থাকত, তুমি আমার কথাটা ঠিক-ঠিক বুঝতে পারতে।"

"খুব বুঝতে পারছি স্যার। আমিও ডগ লাভার। কুকুরদের নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে আমারও খুব বাজে লাগে। আমিও কুকুর পুষতে চাই। আমাকে একটা কুকুরের বাচ্চা দেবে ?"

"নিশ্চয়ই দেব।"

"দেবে !" নিজের কানে কথাটা শুনেও বিশ্বাস করতে পারছিল না টিঙ্কু

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!
Milk Bikis
BRITANNIA
Milk Bikis
সুস্বাদু পুষ্টিকর বিস্কুট
ব্রিটানিয়া

সাহেবের মুখের পাইপটা নিবে গিয়েছিল, সেটা আবার ধরিয়ে নিয়ে সাহেব বলল, "দেব, নিশ্চয়ই দেব। তবে তোমার আগে অনেককেই কথা দিয়েছি তো, কুকুরের বাচ্চা পেতে তোমার একটু দেরি হবে।"

"কত দেরি ?"

"এই ধরো বছর-পাঁচেক।"

"পাঁ-চ বছর !" টিঙ্কু আকাশ থেকে মাটিতে পড়ল ধপাস করে।

পাঁচ বছর মানে তো অনেক দিন। অদ্দিন বাদে ওর আর হয়তো কুকুর পোষার শখই থাকবে না। ইশ্, ঠিক এক্ষুনি একটা কুকুরের বাচ্চা পেলে কী ভালই না হত ! টিঙ্কুদের বাড়ির পাশে একটা নেড়ি কুকুরের চারটে বাচ্চা হয়েছে। সেই বাচ্চাগুলোর গাবলু-গুবলু মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতেই টিঙ্কু বলল, "আচ্ছা, দেশী কুকুরদের ট্রেনিং দেওয়া যায় না ?"

সাহেব ছ্যা-ছ্যা করে উঠে বলল, "ওহ নো নো, দেশী কুকুররা এক্কেবারে স্টুপিড, ওদের কিচ্ছু শেখানো যায় না।"

সাহেবের কথাটা টিঙ্কুর একদম ভাল লাগল না। ও মনে মনে বলল, আহা ! সব বুদ্ধি যেন তোমাদের কুকুরেরই। দেশী কুকুরদের যত্ন করা হয় না, তাই তারা কিচ্ছু শেখে না। তেমন যত্ন করলে ঠিক শিখতে পারবে। তবে মনের কথা ও মনেই রেখে দিল, মুখে কিচ্ছু বলল না।

সাহেব পাইপ টানতে-টানতে কুকুর ট্রেনিং দেওয়ার আরও অনেক গল্প শোনাল টিঙ্কুকে। সন্ধের অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে যেতেই টিঙ্কু বলল, "আজ তাহলে চলি, কাল এসে আরও গল্প শুনব।"

ওকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে সাহেব বলল, "কুকুরদের কক্ষনো বড় নাম রাখতে নেই। বড় নাম মনে রাখতে কষ্ট হয় ওদের। গিভ দেম শর্ট অ্যাণ্ড শার্প নেম্স। যেমন—অ্যান, জুলি, টনি।"

গেটের কাছে এসে টিঙ্কু আর একবার বলল, "আজ তাহলে চলি।"

কিন্তু সাহেবের কথা যেন আর ফুরোচ্ছিল না। সাহেব নিজের মনে কথা বলার ঢঙে বলল, "রোমাঁ রোলাঁর নাম শুনেছ ? রোলাঁ একজন বিখ্যাত লেখক এবং দার্শনিক। কুকরদের খুব ভালবাসতেন তিনি। তাঁর একটা মজার কথা আছে। তিনি লিখেছেন, কুকুরদের যতই ট্রেনিং দাও না কেন, তারা ঠিক তাদের প্রভুদের স্বভাব পাবে। তোমার কুকুর হবে তোমার মতো, আমার কুকুর হবে আমার মতো।"

সাহেব বোধহয় এইসব নিয়ে আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু টিঙ্কুকে উসখুস করতে দেখে বলল, "ওহো রাত হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে আর আটকাব না। কাল আবার এসো, গুড নাইট।"

সাহেবকে শুভরাত্রি জানিয়ে টিঙ্কু এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে এল।

॥ দুই ॥

রোজ সকালে মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে যায় টিঙ্কু। ভোর হলেই ওর ঘুম ভেঙে যায়, কিন্তু ঘুম ভাঙার পরেও ও চুপটি করে শুয়ে থাকে অনেকক্ষণ। বিছানা ছেড়ে কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করে না। শীত পড়ে গেছে বেশ। এই শীতের ভোরে লেপের তলা থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে কারও ? কিন্তু উপায় নেই, মা ধাক্কা মেরে ঠিক তুলে দেবেন বিছানা থেকে। মাকে কখনও শীতে কষ্ট পেতে দেখেনি টিঙ্কু। মা সারা বছর ভোরবেলায় উঠে চান করে নেন প্রথমে, তার পরের কাজই হল আরামের ঘুম থেকে টিঙ্কুকে ঠেলে তোলা। এক-একদিন এই ঠেলাঠেলিটা অনেকক্ষণ ধরে চলে, কিন্তু লড়াই যত বড়ই হোক না কেন, টিঙ্কুকে হারতে হয় শেষ পর্যন্ত।

আজ অবশ্য লড়াই বেশিক্ষণ চলল না। দু-চারবার ধাক্কাধাক্কি করার পরেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল টিঙ্কু। মা বললেন, "বাহ্ ! লক্ষ্মী ছেলে ! এবার চটপট তৈরি হয়ে নাও তো।"

তৈরি হতে টিঙ্কুর কখনোই বেশি সময় লাগে না। তৈরি হয়ে ও যখন বাড়ির বাইরে পা দিল, তখন দূরের ওই পাহাড়ের মাথায় সূর্য। এদিক-সেদিক টুকরো-টুকরো কুয়াশা। দু-পা হাঁটতেই ওর কানে এল কুঁই-কুঁই শব্দ। চমকে তাকিয়ে দেখে পায়ের কাছে সাদায়-কালোয় মেশানো ছোট্ট একটা কুকুরের বাচ্চা। এ নির্ঘাত সেই নেড়ি কুকুরটার বাচ্চাদের একটা। দিন দশ-পনেরো বয়েস, কিন্তু এর মধ্যেই কী সুন্দর হাঁটতে শিখে গেছে।

কুকুরের বাচ্চাটা আর-একবার কুঁই-কুঁই করে উঠল। কেমন যেন কান্না-কান্না শব্দ। ও বোধহয় ওর মাকে হারিয়ে ফেলে কাঁদছে। ওর মা থাকে ওদিকের ওই চালাঘরটার পেছনে। মা'র কাছে পৌঁছে দেবে বলে টিঙ্কু যেই না বাচ্চাটাকে কোলে তুলেছে অমনি ও ভুক্-ভু ভুক্-ভু করে ডেকে উঠে লেজ নাড়তে লাগল। তার মানে খুশি হয়েছে ও। কিন্তু কেন খুশি হল ?

ভোরের আলোয় দারুণ দেখাচ্ছিল বাচ্চাটাকে। কেমন থুপথুপে আর আদুরে-আদুরে চেহারা। টিঙ্কু ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "এই তুই আমার কাছে থাকবি ? আমি তোকে ট্রেনিং দেব, থাকবি ?"

বাচ্চাটা আবার ভুক্-ভু করে ডেকে উঠে লেজ নাড়তে লাগল। অর্থাৎ ও রাজি। কুকুর পোষার উত্তেজনায় টিঙ্কু তিন লাফে বাড়িতে ঢুকে চেঁচাতে লাগল, "মা, শিগ্‌গির দুধ দাও।"

ভেতরের ঘর থেকে মা উত্তর দিলেন, "সে কী রে ! দুধ খাসনি ? তোর দুধ তো টেবিলের ওপর।"

"আমার জন্যে নয়।"

"তবে কার জন্যে ?" বলতে বলতে মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন টিঙ্কুর কোলে ফুটফুটে একটা কুকুরের বাচ্চা। মা অবাক হয়ে বললেন, "ও মা ! এটাকে কোথায় পেলি ?"

টিঙ্কু রহস্যময় ভঙ্গিতে বলল, "ও নিজে-নিজেই এসেছে আমাদের বাড়িতে। ওকে আমি পুষব।"

মা একটা ভাঙা কাপে করে দুধ এনে দিয়ে বললেন, "পুষছ পোষো, কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দিন-রাত্তির কুকুর নিয়ে থেকো না যেন।"

বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে টিঙ্কু ঠিক বড়দের ভঙ্গিতে উত্তর দিল, "ওকেও আমি লেখাপড়া শেখাব।"

টিঙ্কুদের ছাতের ঘরটা ভাঙা জিনিসপত্রে ঠাসা। সেই ঘরটাই হল কুকুরের ঘর। ঘরের মধ্যে ওকে ঢুকিয়ে টিঙ্কু বলল, "আমি এখন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে যাচ্ছি, একটু

পরেই ফিরে আসব। কান্নাকাটি করিস না কিন্তু।" ছাতের ঘরের শেকলটা টেনে দিয়ে টিঙ্কু ছুটল মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে।

কিন্তু পড়ায় একটুও মন বসছিল না টিঙ্কুর। দু'-চারটে ভুল করার পরে মাস্টারমশাই বললেন, "কী ব্যাপার, তুমি তো গুড বয়, তোমার তো এরকম ভুল হয় না!"

টিঙ্কু লজ্জা পেয়ে বলল, "আজ আমি পড়ায় মন বসাতে পারছি না মাস্টারমশাই।"

"কেন?"

"এমনি।"

মাস্টারমশাই একটু হেসে বললেন, "এমনি-এমনি কেউ অমনোযোগী হয় না, কী নিয়ে এত ভাবছ বলো তো?"

প্রশ্রয় পেয়ে টিঙ্কু বলল, "আচ্ছা, দেশী কুকুর ট্রেনিং নেয়?"

মাস্টারমশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, তুমি কুকুর পুষছ নাকি?"

টিঙ্কু থতমত খেয়ে বলল, "না, মানে, আসলে···মাস্টারমশাই, আজ আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন?"

মাস্টারমশাই টিঙ্কুকে খুব ভালবাসেন, ওর মাথায় একটা টোকা মেরে বললেন, "ঠিক আছে, আজ যাও, কিন্তু কাল থেকে খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করতে হবে।"

লম্বা করে একপাশে মাথা কাত করল টিঙ্কু, তারপর বইপত্তর গুছিয়ে নিয়েই ছুট। এক ছুটে ওদের বাড়ির ছাতে। ছাতের ঘরের শেকল তোলা ছিল। কাছে যেতেই ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল ভুক্-ভু ভুক্-ভু। টিঙ্কু অবাক, কুকুরের বাচ্চাটা কী করে বুঝতে পারল ও ফিরে এসেছে! এইটুকু বাচ্চার এত বুদ্ধি দেখে দারুণ খুশি হল টিঙ্কু। ঝপাং করে দরজা খুলে ও কোলে তুলে নিল বাচ্চাটাকে। তুলতুলে বাচ্চাটা কুঁই-কুঁই করে কী যেন বলতে চাইল।

স্কুলে যাওয়ার আগেই কুকুরের ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলল টিঙ্কু। চটের পুরু বিছানা হল কুকুরের। দুধ, জল ও খাবারের তিনটে পাত্র এসে গেল। শীতকাল বলে টিঙ্কু আর চান করাল না বাচ্চাটাকে। ব্রাশ দিয়ে ওর গা পরিষ্কার করে পাউডার মাখিয়ে দিল ভাল করে। তারপর ওর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, "তোর নাম দিলাম তানাই। কেমন নাম? একটু নতুন ধরনের না? তানাই বললেই কিন্তু সাড়া দিবি।"

সেদিন বিকেল থেকেই তানাইকে ট্রেনিং দেওয়া শুরু করে দিল টিঙ্কু। পড়াশুনোর ফাঁকে-ফাঁকে তানাইয়ের ট্রেনিং,আর বিকেল হলেই পিটার সাহেবের কাছে গিয়ে ডগ ট্রেনিংয়ের কায়দা-কানুন শেখা। দেশী কুকুরের বুদ্ধির ওপর সাহেবের একটুও বিশ্বাস নেই বলে টিঙ্কু ওকে তানাইয়ের কথা বলেনি। এমন ভাব দেখায় যেন ট্রেনিংয়ের কায়দাগুলো ও এমনিই শিখছে।

সাহেব বলেছে, কুকুরকে প্রথমেই ওবিডিয়েন্ট করবে। বাধ্য হতে শেখানো ডগ-ট্রেনিংয়ের প্রথম লেসন। তবে লেস্‌ন যেন ছোট-ছোট হয়, অ্যাণ্ড ডু নট ওভারডু দ্য মেন টাস্ক। বেশি শেখালেই বেশি শেখে না, ধৈর্য ধরে অল্প-অল্প করে শেখাতে হবে। নাম ধরে ডাকতে হবে বারবার, যাতে কুকুর বুঝতে পারে ওই নামটা ওর নাম। ভালবাসা আর যত্ন পেলে কুকুর অকারণে ঘেউ-ঘেউ করে না। আদর জানাবার জন্যে মাঝেমধ্যে বাচ্চা কুকুরের সঙ্গে "সফ্‌ট বেবি টক" করতে হবে। যেমন, কী হয়েতে? না-না দুত্‌তুমি করে না, লত্‌তি থোনা আমার—এইসব। কুকুরকে সঙ্গ দিতে হবে অনেকক্ষণ, খেলতে হবে নিয়মিত, ঘড়ি ধরে খাবার দিতে হবে নিজের হাতে।

সাহেবের পরামর্শমতো তো বটেই, নিজেও অনেক কায়দা আবিষ্কার করে তানাইকে ট্রেনিং দিল টিঙ্কু। মাত্র মাস-আড়াইয়ের মধ্যে তানাই বাড়ির সবাইকে অবাক করে দিল। প্রত্যেকের মুখে তানাইয়ের প্রশংসা, কেউ নাকি এত ভাল ট্রেণ্ড ডগ কক্ষনো দেখেনি। তানাই মানুষের মতো কথা বলা ছাড়া আর সব পারে। ও এখন মাঝারি মাপের চমৎকার কুকুর। চোখদুটো ভারী সুন্দর, ওই চোখের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না।

টিঙ্কু লক্ষ করে দেখেছে, কেউ সামনে প্রশংসা জুড়ে দিলে তানাই কেমন যেন লজ্জা পায়। ও কি সব কথার মানে বুঝতে পারে? হয়তো পারে। অনেক সময় কথা না বললেও তানাই কেমন করে যেন টিঙ্কুর মনের কথা ধরে ফেলে। একেই বলে বোধহয় কুকুরদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়! কিন্তু ছটা নয়, তানাইয়ের মনে হয় গোটা-দশেক ইন্দ্রিয় আছে।

টিঙ্কুর ছোটকা একজন প্যাথোলজিস্ট। ছোটকার নেশা হল ভাষা শেখা। অনেকগুলো ভাষা জানেন, আরও কয়েকটা শিখছেন। নিজের কাজকর্ম আর পড়াশুনোর বাইরে ছোটকা অন্য কোনো দিকে নজর দেন না। কিন্তু ছোটকাও আস্তে আস্তে ভক্ত হয়ে উঠলেন তানাইয়ের।

ছোটকা একদিন টিঙ্কুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "আমার মনে হয় তানাই সত্যি-সত্যি কুকুর নয়।"

"অ্যাঁ!" ছোটকার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল টিঙ্কু।

ছোটকা গম্ভীর গলায় বললেন, "ওর যা বুদ্ধি! অনেক মানুষেরও অত বুদ্ধি নেই।"

ডগের প্রশংসা শুনলে যে-কোনো ডগ-মাস্টারের বুক ফুলে ওঠে। টিঙ্কু খুব খুশি হল ছোটকার কথা শুনে।

ছোটকা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, "আমি ভাবছি তানাইকে আরও কয়েকটা ভাষা শেখালে কেমন হয়।"

"ভাষা!"

ছোটকা টিঙ্কুর গোল-হয়ে-ওঠা চোখদুটো হাত দিয়ে চেপে সামান্য ছোট করে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তানাই তো বাংলা জানে, মানে বাংলা কথা বললে ও ঠিক-ঠিক মানে বুঝতে পারে, তাই না?"

টিঙ্কু মাথা কাত করল একপাশে।

বক্তৃতার ঢঙে আবার কথা শুরু করলেন ছোটকা। "কিন্তু বাংলা ওর মাতৃভাষা নয়, বিদেশী ভাষা। একটা বিদেশী ভাষা যদি ও এত অল্প সময়ের মধ্যে শিখতে পারে, আর দু-তিনটে ভাষা ও কেন শিখতে পারবে না? প্রথমেই তো ওকে আমি একগাদা ভাষা শেখাতে যাচ্ছি না। আগে ইংরেজি আর হিন্দি, এ দুটো শিখে গেলে একটু-একটু করে ফরাসি আর জার্মান—।"

টিঙ্কুর চোখ আবার গোল-গোল হয়ে উঠতে দেখে ছোটকা

পরেই ফিরে আসব। কান্নাকাটি করিস না কিন্তু।" ছাতের ঘরের শেকলটা টেনে দিয়ে টিঙ্কু ছুটল মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে।

কিন্তু পড়ায় একটুও মন বসছিল না টিঙ্কুর। দু'-চারটে ভুল করার পরে মাস্টারমশাই বললেন, "কী ব্যাপার, তুমি তো গুড বয়, তোমার তো এরকম ভুল হয় না!"

টিঙ্কু লজ্জা পেয়ে বলল, "আজ আমি পড়ায় মন বসাতে পারছি না মাস্টারমশাই।"

"কেন?"

"এমনি।"

মাস্টারমশাই একটু হেসে বললেন, "এমনি-এমনি কেউ অমনোযোগী হয় না, কী নিয়ে এত ভাবছ বলো তো?"

প্রশ্রয় পেয়ে টিঙ্কু বলল, "আচ্ছা, দেশী কুকুর ট্রেনিং নেয়?"

মাস্টারমশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, তুমি কুকুর পুষছ নাকি?"

টিঙ্কু থতমত খেয়ে বলল, "না, মানে, আসলে···মাস্টারমশাই, আজ আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন?"

মাস্টারমশাই টিঙ্কুকে খুব ভালবাসেন, ওর মাথায় একটা টোকা মেরে বললেন, "ঠিক আছে, আজ যাও, কিন্তু কাল থেকে খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করতে হবে।"

লম্বা করে একপাশে মাথা কাত করল টিঙ্কু, তারপর বইপত্তর গুছিয়ে নিয়েই ছুট। এক ছুটে ওদের বাড়ির ছাতে। ছাতের ঘরের শেকল তোলা ছিল। কাছে যেতেই ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল ভুক্-ভু ভুক্-ভু। টিঙ্কু অবাক, কুকুরের বাচ্চাটা কী করে বুঝতে পারল ও ফিরে এসেছে! এইটুকু বাচ্চার এত বুদ্ধি দেখে দারুণ খুশি হল টিঙ্কু। ঝপাং করে দরজা খুলে ও কোলে তুলে নিল বাচ্চাটাকে। তুলতুলে বাচ্চাটা কুঁই-কুঁই করে কী যেন বলতে চাইল।

স্কুলে যাওয়ার আগেই কুকুরের ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলল টিঙ্কু। চটের পুরু বিছানা হল কুকুরের। দুধ, জল ও খাবারের তিনটে পাত্র এসে গেল। শীতকাল বলে টিঙ্কু আর চান করাল না বাচ্চাটাকে। ব্রাশ দিয়ে ওর গা পরিষ্কার করে পাউডার মাখিয়ে দিল ভাল করে। তারপর ওর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, "তোর নাম দিলাম তানাই। কেমন নাম? একটু নতুন ধরনের না? তানাই বললেই কিন্তু সাড়া দিবি।"

সেদিন বিকেল থেকেই তানাইকে ট্রেনিং দেওয়া শুরু করে দিল টিঙ্কু। পড়াশুনোর ফাঁকে-ফাঁকে তানাইয়ের ট্রেনিং,আর বিকেল হলেই পিটার সাহেবের কাছে গিয়ে ডগ ট্রেনিংয়ের কায়দা-কানুন শেখা। দেশী কুকুরের বুদ্ধির ওপর সাহেবের একটুও বিশ্বাস নেই বলে টিঙ্কু ওকে তানাইয়ের কথা বলেনি। এমন ভাব দেখায় যেন ট্রেনিংয়ের কায়দাগুলো ও এমনিই শিখছে।

সাহেব বলেছে, কুকুরকে প্রথমেই ওবিডিয়েন্ট করবে। বাধ্য হতে শেখানো ডগ-ট্রেনিংয়ের প্রথম লেসন। তবে লেস্‌ন যেন ছোট-ছোট হয়, অ্যাণ্ড ডু নট ওভারডু দ্য মেন টাস্ক। বেশি শেখালেই বেশি শেখে না, ধৈর্য ধরে অল্প-অল্প করে শেখাতে হবে। নাম ধরে ডাকতে হবে বারবার, যাতে কুকুর বুঝতে পারে ওই নামটা ওর নাম। ভালবাসা আর যত্ন পেলে কুকুর অকারণে ঘেউ-ঘেউ করে না। আদর জানাবার জন্যে মাঝেমধ্যে বাচ্চা কুকুরের সঙ্গে "সফ্‌ট বেবি টক" করতে হবে। যেমন, কী হয়েতে? না-না দুত্‌তুমি করে না, লত্‌তি থোনা আমার—এইসব। কুকুরকে সঙ্গ দিতে হবে অনেকক্ষণ, খেলতে হবে নিয়মিত, ঘড়ি ধরে খাবার দিতে হবে নিজের হাতে।

সাহেবের পরামর্শমতো তো বটেই, নিজেও অনেক কায়দা আবিষ্কার করে তানাইকে ট্রেনিং দিল টিঙ্কু। মাত্র মাস-আড়াইয়ের মধ্যে তানাই বাড়ির সবাইকে অবাক করে দিল। প্রত্যেকের মুখে তানাইয়ের প্রশংসা, কেউ নাকি এত ভাল ট্রেণ্ড ডগ কক্ষনো দেখেনি। তানাই মানুষের মতো কথা বলা ছাড়া আর সব পারে। ও এখন মাঝারি মাপের চমৎকার কুকুর। চোখদুটো ভারী সুন্দর, ওই চোখের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না।

টিঙ্কু লক্ষ করে দেখেছে, কেউ সামনে প্রশংসা জুড়ে দিলে তানাই কেমন যেন লজ্জা পায়। ও কি সব কথার মানে বুঝতে পারে? হয়তো পারে। অনেক সময় কথা না বললেও তানাই কেমন করে যেন টিঙ্কুর মনের কথা ধরে ফেলে। একেই বলে বোধহয় কুকুরদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়! কিন্তু ছটা নয়, তানাইয়ের মনে হয় গোটা-দশেক ইন্দ্রিয় আছে।

টিঙ্কুর ছোটকা একজন প্যাথোলজিস্ট। ছোটকার নেশা হল ভাষা শেখা। অনেকগুলো ভাষা জানেন, আরও কয়েকটা শিখছেন। নিজের কাজকর্ম আর পড়াশুনোর বাইরে ছোটকা অন্য কোনো দিকে নজর দেন না। কিন্তু ছোটকাও আস্তে আস্তে ভক্ত হয়ে উঠলেন তানাইয়ের।

ছোটকা একদিন টিঙ্কুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "আমার মনে হয় তানাই সত্যি-সত্যি কুকুর নয়।"

"অ্যাঁ!" ছোটকার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল টিঙ্কু।

ছোটকা গম্ভীর গলায় বললেন, "ওর যা বুদ্ধি! অনেক মানুষেরও অত বুদ্ধি নেই।"

ডগের প্রশংসা শুনলে যে-কোনো ডগ-মাস্টারের বুক ফুলে ওঠে। টিঙ্কু খুব খুশি হল ছোটকার কথা শুনে।

ছোটকা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, "আমি ভাবছি তানাইকে আরও কয়েকটা ভাষা শেখালে কেমন হয়।"

"ভাষা!"

ছোটকা টিঙ্কুর গোল-হয়ে-ওঠা চোখদুটো হাত দিয়ে চেপে সামান্য ছোট করে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তানাই তো বাংলা জানে, মানে বাংলা কথা বললে ও ঠিক-ঠিক মানে বুঝতে পারে, তাই না?"

টিঙ্কু মাথা কাত করল একপাশে।

বক্তৃতার ঢঙে আবার কথা শুরু করলেন ছোটকা। "কিন্তু বাংলা ওর মাতৃভাষা নয়, বিদেশী ভাষা। একটা বিদেশী ভাষা যদি ও এত অল্প সময়ের মধ্যে শিখতে পারে, আর দু-তিনটে ভাষা ও কেন শিখতে পারবে না? প্রথমেই তো ওকে আমি একগাদা ভাষা শেখাতে যাচ্ছি না। আগে ইংরেজি আর হিন্দি, এ দুটো শিখে গেলে একটু-একটু করে ফরাসি আর জার্মান—।"

টিঙ্কুর চোখ আবার গোল-গোল হয়ে উঠতে দেখে ছোটকা

বক্তৃতা থামিয়ে বললেন, "ও নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না, ওটা আমার সাবজেক্ট।".

ব্যস, শুরু হয়ে গেল তানাইয়ের ভাষাশিক্ষা।

ছোটকা প্রতিদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে তানাইকে ভাষা শেখাতে শুরু করে দিলেন। পুরো দু-ঘণ্টার ক্লাস। টিঙ্কু ঘরের বাইরে থেকে শুনতে পেত ছোটকা শেখাচ্ছেন—বোসো, বৈঠো, সিট ডাউন।

এইভাবে দিন-সাতেক ক্লাস চলার পরে ছোট্ট একটা গোলমাল দেখা দিল। তানাইয়ের সুন্দর চোখদুটো কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে গেছে। মুখে সেই হাসি আর নেই, ছুটোছুটিও কমে গেছে একদম। আগের মতো ও আর কথা বুঝতে পারে না। 'বোসো' বললে আর বসে না, কিন্তু একসঙ্গে বোসো, বৈঠো, সিট ডাউন' বললে বসে। শুধু 'দাঁড়াও' বললে দাঁড়ায় না, কিন্তু একসঙ্গে 'দাঁড়াও, খাড়া হো যাও, স্ট্যাণ্ড আপ' বললে দাঁড়ায়।

প্রাণের কুকুর তানাইয়ের ওই দশা দেখে টিঙ্কু কাঁদতে-কাঁদতে মা'র কাছে ছুটল। মা যত জিজ্ঞেস করেন, "কী হয়েছে বল", টিঙ্কু তত কাঁদতে থাকে। শেষকালে অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে বলল, "মা, তুমি শিগগির গিয়ে ছোটকাকে বলো, তানাইয়ের আর ক্লাস নিতে হবে না। ছোটকার কাছে আর কিছুদিন ক্লাস করলে ও ঠিক পাগল হয়ে যাবে।"

এ-বাড়ির সবাই তানাইকে খুব ভালবাসে, কেউ চায় না ওর কোনো ক্ষতি হোক। টিঙ্কুর মা তাড়াতাড়ি গিয়ে বললেন, "ছোড়দা, তানাই তো একেবারেই ছেলেমানুষ, ও কি অত ভাষাটাষা শিখতে পারবে এখন! একটু বড় হোক, তারপর না হয় তুমি—"

ছোড়দা একটা সবজান্তার হাসি হেসে বৌদিকে থামিয়ে দিলেন। "ও নিয়ে কিচ্ছু ভেবো না তুমি। আসলে, হিন্দি জেণ্ডার আর ইংরেজি ভার্ব-এর ইউসেজ নিয়ে একটু গোলমালে পড়েছে তানাই। ও ঠিক হয়ে যাবে।"

নিরুপায় হয়ে টিঙ্কু তানাইকে কোলে নিয়ে সামনের বাগানে চলে গেল। তারপর চারদিক দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "দ্যাখ্, তানাই, তুই-ই একমাত্র নিজেকে বাঁচাতে পারিস। ছোটকা যখন তোকে ভাষা শেখাতে যাবে তুই রেগে যাওয়ার ভান করে কামড়াতে যাবি। সত্যি-সত্যি আবার দাঁত বসিয়ে দিস না কিন্তু। তুই কামড়াতে যাচ্ছিস দেখলে ছোটকা তোকে পড়ানো ছেড়ে দেবে।"

তানাইয়ের কানে-কানে এই পরামর্শ দিয়ে স্কুলে চলে গেল টিঙ্কু।

বিকেলে যখন বাড়ি ফিরল, তখন ছোটকার ঘরে হৈচৈ। ছোটকা ঘরের লোকদের সামনে চিৎকার করে বলছেন, "আনরুলি ডগ, আমি ওকে পড়াতে গেলাম আর ও আমাকে কামড়াতে এল! অসম্ভব, ওর দ্বারা লেখাপড়া হবে না। থাক গোমুখ্যু হয়ে। ওকে আমি আর পড়াব না, সময়ের দাম আছে আমার।"

কী হয়েছে টিঙ্কুকে আর বলে দিতে হল না। ও সবার চোখের আড়ালে তানাইকে বগলদাবা করে ছাতে এসে হাঁপ ছেড়ে বলল, "যাক বাবা! তুইও বাঁচলি, আমিও বাঁচলাম!"

তানাই আনন্দে লেজ নেড়ে বলল, আঁ-উ-উ-উ আঁ-উ-উ-উ-উ।

॥ তিন ॥

এক রোববার বিকেলে টিঙ্কু তানাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "আজ তোকে পরীক্ষা দিতে যেতে হবে। পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট করতে না পারলে কিন্তু আমার মুখ থাকবে না। কী রে, পারবি তো?"

তানাই কী বুঝল কে জানে, ওর চোখমুখ শুধু চকচক করে উঠল। বারতিনেক লেজ নেড়ে ওর সামনের পা দুটো তুলে দিল টিঙ্কুর কোলে।

বিকেলবেলায় টিঙ্কু তানাইকে নিয়ে হাজির হল পিটারসাহেবের বাড়িতে। তানাইকে দেখে সাহেবের সাতটা কুকুর তেড়ে এল একসঙ্গে। সাহেব অমনি এক ধমক লাগাল ওদের, "ওহ্ নো, ডোণ্ট বাইট হিম।"

ধমক খেয়ে সাতটা কুকুর যে যার জায়গায় ফিরে গিয়ে চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে থাকল তানাইয়ের দিকে। টিঙ্কু ফিসফিস করে বলল, "একদম ভয় পাস না তানাই, কেউ তোকে কামড়াবে না।"

সাহেব অবাক চোখে তানাইকে দেখে বলল, "এই দেশী কুকুরটাকে তুমি কোত্থেকে ধরে আনলে টিঙ্কু?"

টিঙ্কু গম্ভীর হয়ে বলল, "ধরে আনিনি স্যার, এ আমার ট্রেণ্ড ডগ তানাই।"

সাহেব হা-হা করে হেসে উঠে বলল,"তুমি আমাকে অবাক করলে! দেশী কুকুর আবার ট্রেনিং নিতে পারে নাকি! এটাকে

এক্ষুনি বিদেয় করো তো।"

অপমানে টিঙ্কুর কান-মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। বারবার দেশী কুকুর দেশী কুকুর বলে অবজ্ঞা দেখালে কার না রাগ হয়! জেদি ছেলের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে টিঙ্কু পালটা প্রশ্ন করল, "তুমি বোধহয় কখনো শিক্ষিত দেশী কুকুর দেখোনি?"

সাহেব আবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না। বেশ কিছুক্ষণ হ্যা-হ্যা করার পরে সাহেব বলল, "তুমি আমাকে অদ্ভুত একটা কথা শোনালে টিঙ্কু। দেশী কুকুরের পক্ষে কি শিক্ষিত হওয়া সম্ভব! ভাল ট্রেনিং নিতে গেলে ভাল ব্রেন থাকা দরকার। দেশী কুকুরের মাথায় ব্রেন বলে কোনো পদার্থই নেই।"

টিঙ্কু বিরক্ত হয়ে বলল, "এটা তোমার ধারণা।"

সাহেব আর একটু হেসে নিয়ে উত্তর দিল, "আমার ধারণাটা কিন্তু সত্যি।"

টিঙ্কুর চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছিল, ও সামান্য উঁচু গলায় বলল, "আমার কুকুর রীতিমত ট্রেণ্ড, ওকে আমিই ট্রেনিং দিয়েছি। তানাই, সাহেবের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করো।"

বলামাত্র তানাই ওর একটা পা বাড়িয়ে দিল সাহেবের দিকে। সাহেব তানাইয়ের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বলল, "বাহ্! এ তো দেখছি একটু-আধটু শিখেছে। তবে দেশী কুকুর তো, এর বেশি শিখতে পারবে না।"

টিঙ্কু সাহেবের কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "বাগানের গেটটা বন্ধ করে দাও তো তানাই।"

তানাই অমনি ছুটে গিয়ে গেটের খিলটা আটকে দিল মুখ দিয়ে।

তাই না দেখে সাহেব চমকে গিয়ে সোজা হয়ে বসল। "স্ট্রেঞ্জ! দেশী কুকুর, অথচ এত বুদ্ধি!"

টিঙ্কু এবারও সাহেবের কথায় উত্তর দিল না, তারপর পা থেকে চটি খুলে তানাইকে বলল, "চটিদুটো ওই ঘরে রেখে আয় তো।" তানাই সঙ্গে সঙ্গে চটিদুটো ঘরে রেখে এল। চটি ঘরে রাখতে দেখে সাহেব এতই অবাক হল যে, ওর হাতের ধাক্কায় তামাকের প্যাকেটটা পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে টিঙ্কু প্যাকেটটার দিকে আঙুল তুলে বলল, "তানাই, প্যাকেটটা টেবিলের ওপর তুলে রাখ।" কথা শেষ হবার আগেই তানাই প্যাকেটটা মুখে করে তুলে রাখল টেবিলে।

সামান্য একটা দেশী কুকুরকে পরের পর এত সব আশ্চর্য কাণ্ড করতে দেখে সাহেবের কথা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কী যেন বলতে গিয়ে তোতলাবার পরে সাহেব বলল, "অবাক কাণ্ড! তোমার তানাই এসব পিকআপ করল কী করে? গেটের খিল খোলা ভীষণ কঠিন কাজ, আমি অনেক চেষ্টা করে আমার অ্যানকে শিখিয়েছি। তোমার তানাই দেখি গেট বন্ধও করতে পারে!"

টিঙ্কু অনেকক্ষণ পরে এই প্রথম হাসল। পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করলে ভাল ছাত্ররা যে-ভাবে হাসে, ঠিক সেই ধরনের হাসি। এ তো শুধু তানাইয়ের পরীক্ষা নয়, তানাইয়ের মাস্টারমশাইয়ের পরীক্ষাও হয়ে গেল এইসঙ্গে। টিঙ্কুকে হাসতে দেখে তানাই লেজ নাড়তে লাগল।

টিঙ্কু হাসতে হাসতে বলল, "তুমি তো তানাইয়ের সামান্য কয়েকটা খেলা দেখলে, ও আরও অনেক কিছু জানে। ও খুব ভাল গানও গায়।"

"গান! কুকুর গান গায়?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সাহেব।

টিঙ্কু তানাইকে আদর করে বলল, "তানাই, একটা গান গাও তো।"

অমনি তানাই গান শুরু করল— ভৌ-উ-উ-উ-উ-উ···।

তানাইয়ের গান শুনে সাহেবের চোখ গোল-গোল হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ওর চোখে পলক পড়ল না একবারও।

গান শেষ হলে টিঙ্কু তানাইকে আর একবার আদর করে বলল, "লক্ষ্মী সোনা, এবার একটা নাচ দেখাও তো।"

গান গাইলে কার না মেজাজ ভাল হয়! তার ওপর আবার এ গানটা সবার খুব ভাল লেগেছে। মনের আনন্দে তানাই নাচ শুরু করে দিল। পেছনের দু-পায়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে-ঘুরে সে কী নাচ!

চোখ বড়-বড় করে সেই নাচ দেখতে লাগল পিটারসাহেব আর তার সাতটা কুকুর। ওদের চোখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, এমন নাচ ওরা আগে কখনও দেখেনি। নাচ দেখে সাহেব এত মুগ্ধ হয়েছিল যে, নাচ শেষ হবার পরে হাততালি দেবার কথা পর্যন্ত ভুলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে টিঙ্কু মিটমিট করে হাসতে হাসতে বলল, "কেমন দেখলে তানাইয়ের নাচ?"

সাহেবের যেন জ্ঞান ছিল না, টিঙ্কুর কথায় থতমত খেয়ে বলল, "ওঁয়াণ্ডারফুল! আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, দেশী কুকুর এত সব শিখল কী করে!"

সাহেবের কথায় টিঙ্কু এবার বেশ চটে গিয়ে বলল, "তখন থেকে দেশী-দেশী করছ কেন বলো তো? কোনো সাহেবকুকুর কি এত ভাল খেলা দেখাতে পারে?"

এ-কথার কোনো উত্তর দিতে পারল না সাহেব। লজ্জায় ওর মুখ নিচু হয়ে গেল।

সাহেবকে মুখ নিচু করে থাকতে দেখে সাহেবের কুকুরগুলোও কেমন যেন মনমরা হয়ে গিয়েছিল। হাসিখুশি সাহেবকে এত চুপচাপ হয়ে যেতে দেখে টিঙ্কুর খারাপ লাগছিল খুব, কিন্তু ও বিস্তর মাথা খাটিয়েও সাহেবের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় বার করতে পারল না।

আস্তে-আস্তে সন্ধের অন্ধকার নামছিল আকাশ থেকে। হাওয়ায় শীত বাড়ছে একটু-একটু করে। বেয়ারা আফজল পেটমোটা চেহারার একটা লণ্ঠন এনে রাখল টেবিলের ওপর। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎই একটা কথা খুঁজে পেল টিঙ্কু, সাহেবের খুশি হওয়ার মতো কথা। বেশ তারিফ করার গলায় ও বলল, "তোমার কুকুরদের স্বাস্থ্য কী ভাল! আমার তানাই তো একেবারে রোগা টিঙটিঙে।"

টিঙ্কুর কথায় সাহেব কিন্তু একটুও খুশি হল না, থমথমে গলায় বলল, "বুদ্ধিই যদি না থাকে স্বাস্থ্য দিয়ে হবেটা কী!"

অবাক হল টিঙ্কু। "বুদ্ধি নেই! সাতটা কুকুরই তো অসম্ভব বুদ্ধিমান।"

"হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হত, কিন্তু এখন আর এদের বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে না।"

এ-কথা সাহেব কেন বলছে পরিষ্কার বুঝতে পারল টিঙ্কু, কিন্তু নেহাতই ঝোঁকের মাথায় ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "কেন?"

সাহেব এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না, ওর নাক-মুখ থেকে বিরাট একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল শুধু। তারপরে

তৎপর হয়ে উঠল সাহেব। "আরে! আজ বিকেলে তো আমরা চা-টা খাইনি।"

আফজল একটু দুরেই দাঁড়িয়ে ছিল। সাহেবের ইঙ্গিতে কফি, দুধ আর খাবারের পাহাড় বানিয়ে ফেলল টেবিলের ওপর। সাহেব প্রথমেই দুটো মোটা-মোটা স্যাণ্ডউইচ খাওয়াল তানাইকে। সাহেবের আদর আর স্যাণ্ডউইচ খেয়ে তানাইয়ের লেজ নেচেই যাচ্ছিল সমানে। ডগের খাওয়া শেষ হলে ডগ-মাস্টারের দিকে দুধের কাপ এগিয়ে দিল সাহেব। টিঙ্কু কয়েকটা বিস্কুট তুলে নিয়ে সাহেবের কুকুরদের সামনে ছড়িয়ে দিল। অন্য সময় কুকুরগুলো লাফিয়ে-লাফিয়ে বিস্কুট খায়, কিন্তু এখন এমনভাবে খেল যেন নেহাতই ভদ্রতা দেখাচ্ছে। এই তিন মাসে কুকুরদের সম্পর্কে টিঙ্কুর অনেক জ্ঞান হয়েছে। ও স্পষ্ট বুঝতে পারল, সাহেব চটে গেছে বলে ওর কুকুরদেরও মন খারাপ।

চায়ে চুমুক দিয়ে পাইপ ধরাল সাহেব, তারপর টিঙ্কুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, তোমার কুকুরের পুরো ট্রেনিংটা কি তুমিই দিয়েছ?"

গর্বে বুক ফুলে উঠল টিঙ্কুর। "হ্যাঁ, আমি একাই।"

সাহেবের চোখ-মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। "কিন্তু কুকুরকে ট্রেনিং দেওয়া তো খুব কঠিন কাজ। ট্রেনিং দেওয়ার কায়দা-টায়দাগুলো তুমি শিখলে কোত্থেকে?"

বহুক্ষণ বাদে সাহেবকে খুশি করার সুযোগ পেল টিঙ্কু। কিন্তু এটা নেহাতই খুশি করার ব্যাপার নয়, কথাটা সত্যিও। টিঙ্কু বেশ আবেগ দিয়ে বলল, "তানাইয়ের আসল ট্রেনার তো তুমিই। তোমার কাছ থেকে ডগ ট্রেনিংয়ের কায়দাগুলো আমি শিখে নিয়ে তানাইকে ট্রেন করেছি।"

"কিন্তু শুধুমাত্র ট্রেনিং দিয়ে···আসলে আমার মনে হয় তোমার কুকুর অসাধারণ···"

সাহেবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে টিঙ্কু বলল, "ঠিক কথা, তানাই অসাধারণ কুকুর। ওকে ট্রেনিং দিতে আমার একটুও অসুবিধে হয়নি। একবার দেখিয়ে দিলেই ও চটপট বুঝে যায়। শুধু মুখের কথাই নয়, ও আমার মনের কথাও ধরতে পারে।"

সাহেব অবাক হয়ে বলল, "বলো কী!"

"হ্যাঁ, সত্যিই তাই। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না।"

টিঙ্কুর কথায় সাহেবের কপালে ভাঁজ পড়ল অনেকগুলো। পাইপ টানতে টানতে সাহেব কী যেন ভেবে নিয়ে পাইপের ছাই অ্যাশট্রেতে উলটে দিয়ে বলল, "টিঙ্কু, দি আদার ডে আই প্রমিজড ইউ আ পাপি, এবার সত্যিই তোমাকে আমি একটা কুকুরের বাচ্চা দিতে পারব। কয়েকদিন আগে দিল্লির কেনেল ক্লাবের ভাইস-প্রেসিডেন্টের কুকুরের কয়েকটা বাচ্চা হয়েছে। কালকেই চিঠি এসেছে আমার কাছে। হাইলি পেডিগ্রিড ডগ, বড় বংশ, ওই বংশের সাত পুরুষের খবর যে-কোনো ডগ-লাভারের মুখস্থ। ভাইস-প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা হয়ে আছে আমার, একটা বাচ্চা আমি পাব। আর আমার খুব ইচ্ছে, ওই বাচ্চাটা অমি প্রেজেন্ট করব তোমাকে।"

প্রচণ্ড উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল টিঙ্কু, "সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি নয় তো কী, আমার কথা নড়চড় হয় না কখনও। কিন্তু···"

"কিন্তু কী?"

"একটা শর্ত আছে।"

"আমি সব শর্ত মানতে রাজি আছি।" ভাল বংশের ভাল কুকুর পাওয়ার উত্তেজনায় টিঙ্কুর চোখমুখ লালচে হয়ে উঠেছিল।

সাহেব গম্ভীরভাবে পাইপে তামাক ঠাসল, তারপর লাইটার জ্বালিয়ে পাইপ ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "শর্তটা হল তানাইকে দিয়ে দিতে হবে।"

"দিয়ে দিতে হবে মানে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করল টিঙ্কু।

সাহেব মুচকি হেসে বলল, "দিয়ে দেবার একটাই অর্থ। দিয়ে দিতে হবে মানে আমাকে দিয়ে দেবে, বরাবরের জন্য। তার বদলে আমি তোমাকে একটা পেডিগ্রিড ডগ দেব। লাভ তো তোমারই, সামান্য একটা দেশী কুকুরের বদলে তুমি একটা ভাল বংশের কুকুর পাবে।"

সাহেবের কথা শুনে রাগে-দুঃখে টিঙ্কু বোবা হয়ে গেল। বলে কী সাহেবটা! প্রাণের কুকুর তানাইকে ও দিয়ে দেবে বরাবরের জন্য! এর চাইতে বোধহয় নিজের একটা হাত কেটে দেওয়া অনেক সহজ।

টিঙ্কুকে চুপ করে থাকতে দেখে সাহেব ভাবল, টিঙ্কুর বোধহয় মত আছে। রাজ্যের স্নেহ গলায় ঢেলে সাহেব বলল, "ভাল বংশের কুকুর পুষতে গেলে অনেক যত্ন-টত্ন করতে হয়। তবে তার জন্য তুমি কিছু ভেবো না। আমি তো তোমার বন্ধু—বন্ধু বলেই বলছি, ওই কুকুরটার থাকা-খাওয়া, ট্রেনিং, এক্সারসাইজ আর চিকিৎসার জন্য আমি কিছু টাকা-পয়সাও দেব তোমাকে।"

রাগে এবার ফেটে পড়ল টিঙ্কু। সামান্য তোতলাতে-তোতলাতে বলল, "বুঝতে পারছি টাকাটাই তোমার কাছে সব। বেশি টাকা পেলে তুমি বোধহয় তোমার এই সাতটা কুকুরকে এক্ষুনি বেচে দিতে পারো, না? চলে আয়, তানাই।"

সাহেব একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে টিঙ্কুর হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলল, "প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড টিঙ্কু। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে টাকা দেখাচ্ছি না, ইট ওয়াজ জাস্ট আ রিকোয়েস্ট। আসলে ব্যাপারটা কী জানো, আমরা তিন পুরুষের ডগ-ট্রেনার, কিন্তু এত বুদ্ধিমান কুকুর কখনও দেখিনি। ঠিক আছে, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, প্লিজ

ফরগিভ মি। তানাই, এই নাও, আর একটা স্যাণ্ডুইচ খাও।"

স্যাণ্ডুইচ তানাইয়ের খুব ভাল লেগেছিল, আগের দুটো ও হাম-হাম করে খেয়েছে। কিন্তু এবার ও সাহেবের হাতের স্যাণ্ডুইচ শুঁকেও দেখল না, মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। তাই না দেখে সাহেব অবাক হয়ে বলল, "স্ট্রেঞ্জ! তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা-কাটাকাটি হয়েছে দেখে তোমার কুকুর আমার স্যাণ্ডুইচ খেল না।"

তানাইয়ের কাণ্ড দেখে টিঙ্কুও কম অবাক হয়নি। কিন্তু ঘটনাটা সত্যি কি না দেখার জন্য ও তানাইয়ের পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে বলল, "ছিঃ তানাই, ওরকম করতে নেই। সাহেব ভালবেসে দিচ্ছে, খেয়ে নাও।"

একই কথা বারদুয়েক বলার পরে তানাই একটু দোনামনা করে সাহেবের হাতের স্যাণ্ডুইচটা খেয়ে নিল। কুকুরের বুদ্ধি দেখে সাহেবের চোখদুটো প্রায় কপালে উঠে গেছে। আর টিঙ্কুর এত আনন্দ হল যে, সাহেবের সঙ্গে ঝগড়াঝাটির কথাও একেবারে ভুলে গিয়ে বলল, "রাত হয়ে যাচ্ছে, এবার আমি চলি। পরে আবার দেখা হবে, গুডনাইট।"

সাহেবের চোখদুটো এখনও কপাল থেকে নামেনি। কোনোমতে একটা হাত ওপরে তুলে সাহেব বলল, "নাইট।"

॥ চার ॥

ভোর-রাত্তিরের দিকে তানাইয়ের অস্বাভাবিক চিৎকারে টিঙ্কুদের ঘুম ভেঙে গেল এক-এক করে। কী ব্যাপার! তানাই ওভাবে ডাকছে কেন?

পট-পট করে এ-বাড়ির সব আলো জ্বলে গেল। টিঙ্কুর বাবা দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন, পেছন-পেছন টিঙ্কু আর ওর মা। পাশের ঘর থেকে ছোটকাও বেরিয়ে এসেছেন। ছাতের ওপর তানাই তখনও চিৎকার করে যাচ্ছে সমানে। হল কী কুকুরটার!

ছাতের আলো জ্বেলে সবাই উঠে গেল ছাতে। ওদের দেখে তানাই ছুটে এসে একবার লেজ নাড়ল, তারপর আবার ছাতের মধ্যিখানে গিয়ে গর-গর করতে লাগল। ওর গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, গলার স্বরটাও কেমন যেন অচেনা। গর-গর করতে করতে অস্বাভাবিক গলায় কয়েকবার ডেকে উঠল তানাই। কিন্তু কোথাও কোনোরকম অস্বাভাবিক ব্যাপার কারও চোখে পড়ল না। টিঙ্কুর বাবা বললেন, "বেড়াল-টেড়াল এসেছিল বোধহয়।"

কিন্তু বেড়াল এলে সে বেড়াল তো চলেও গেছে বহুক্ষণ। তানাই এখনও কেন চিৎকার করবে? টিঙ্কুর মা বললেন, "আমার মনে হয় স্বপ্ন-টপ্ন দেখে ও ভয় পেয়েছে। ছেলেমানুষ কুকুর, এবার থেকে নীচের বারান্দায় ওর শোবার জায়গা করে দিস তো।"

কুকুর সত্যিই দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করে কি না, কারও জানা নেই। সুতরাং ও-কথার প্রতিবাদ করল না কেউ। কিন্তু তানাইকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কেউ যদি ভিতু বলে তো টিঙ্কুর ভাল লাগার কথা নয়, লাগলও না। ও মিনমিন করে বলল, "ও তো সেই এতটুকু বয়েস থেকে একা-একা ছাতে শোয়, কিন্তু কই কক্ষনো তো ভয় পায়নি।"

ছোটকা তখন থেকে গম্ভীর হয়ে চারদিক দেখে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, "আরে! এটা কী?"

কী জানার জন্য সবাই প্রায় ছুটে গেল ছোটকার কাছে। ছোটকার হাতে টর্চ। টর্চের ফোকাসে সবাই দেখল, মাংসজড়ানো এক টুকরো রুটি পড়ে আছে ছাতের কোনায়। সন্দেহের গলায় ছোটকা বললেন, "এটা এখানে এল কোত্থেকে?"

"কোত্থেকে আসবে আবার, কাকে-টাকে ফেলেছে বোধহয়।" খুব সহজ গলায় উত্তর দিলেন টিঙ্কুর মা। কিন্তু কড়া পরীক্ষকের কায়দায় দু'পাশে মাথা ঝাঁকিয়ে কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন ছোটকা। তারপর জ্বলন্ত টর্চটা নাচাতে-নাচাতে বললেন, "কাক রুটি-মাংস ফেলবে কেন? বরং কোথাও পড়ে থাকতে দেখলে তুলে নিয়ে যাবে।"

মা ছোটকার এত ভারিক্কি চালের কথায় একটুও গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, "তা হলে এটা বোধহয় তানাইয়েরই খাবার। খেতে ইচ্ছে হয়নি, তাই এখানে এনে ফেলে দিয়েছে।"

ছোটকা গলা আরও ভারী করে বললেন, "অসম্ভব!"

"কেন, অসম্ভব কেন?"

ছোটকা প্রমাণ দাখিলের ভঙ্গিতে বলেন, "বাড়িতে তিন-চারদিন মাংস আসেনি, তানাইয়ের খাবারে তাহলে মাংস এল কোত্থেকে?"

"ও মা! সত্যিই তো!" অবাক হয়ে গালে হাত দিলেন টিঙ্কুর মা।

ছাতের চার কোনায় টর্চের আলোটা আর-একবার ঘুরিয়ে নিয়ে ছোটকা গম্ভীরভাবে বললেন, "রুটি-মাংসটা আমি টেস্ট করব।"

তাই শুনে আঁতকে উঠে টিঙ্কুর মা বললেন, "এ মা ছোড়দা, তোমার কি ঘেন্না-পিত্তি বলে কিছু নেই! কে জানে কোথাকার খাবার, আর তাই তুমি মুখে দেবে!"

ছোটকা এবার গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। হাসি আর থামতেই চায় না। শেষে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "বৌদি, আমি প্যাথোলজিস্ট। এই রুটি-মাংস খাব না, যন্ত্রপাতি দিয়ে টেস্ট করে দেখব ওর মধ্যে আর কিছু আছে কি না।"

ছোটকার কথায় টিঙ্কুর বাবা হেসে উঠলেন। টিঙ্কুও হাসতে লাগল। মা হাত-মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "কী জানি বাবা, তোমাদের পক্ষে সবই সম্ভব।"

হাসির শব্দেই বোধহয় তানাই চিৎকার থামিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল আবার। ওর গায়ের খাড়া-খাড়া লোমগুলো শুয়ে পড়েছে আগের মতো। লক্ষ্মী কুকুরের মতো লেজ নেড়ে-নেড়ে ও টিঙ্কুর পায়ে মুখ ঘসছিল।

উত্তেজনা কমে যাওয়ার পরে প্রত্যেকেই টের পেল, ভোরের হাওয়া বেশ কনকনে। গায়ের চাদরে কান-মাথা জড়িয়ে ছাত থেকে নীচে নামার সময় টিঙ্কুর বাবা বললেন, "যাহ্, ভোরের এত আরামের ঘুমটা মাটি করে দিল কুকুরটা। নাও, একটু চা-টা করো।"

টিঙ্কুর ছোটকার হাতে কাগজে মোড়া সেই রুটি-মাংস, নিজের ঘরে ঢোকার সময় ছোটকা বললেন, "আমাকেও এক কাপ দিও বৌদি।"

মা গেলেন রান্নাঘরে, বাবা আর ছোটকা যে যার ঘরে। টিঙ্কু তানাইকে কোলে নিয়ে বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল।

আকাশে আবছা ভোরের আলো। গাছের মাথায় কয়েকটা পাখি চাপা গলায় কিচমিচ শুরু করে দিয়েছে। ভোরে উঠতে টিঙ্কুর ভীষণ-কষ্ট হয়, কিন্তু একবার উঠে পড়তে পারলে মন্দ লাগে না। এখন যেমন, ওর চোখের সামনে সারা পৃথিবী জেগে উঠছিল আস্তে-আস্তে। তানাইয়ের গায়ে-মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে টিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "তুই অত চিৎকার করছিলি কেন রে ?"

কুঁই-কুঁই করে উত্তর দিল তানাই, কিন্তু ওর কথাটার মানে বুঝতে পারল না টিঙ্কু।

একটু পরে মা দু-কাপ চা দু-ঘরে দিয়ে এসে বললেন, "একটু চা খাবি নাকি রে টিঙ্কু।" টিঙ্কুর কপালে চা জোটে কালেভদ্রে। ও খুব খুশি হয়ে মাথা কাত করল একপাশে। মা আধকাপ চা টিঙ্কুর হাতে দিয়ে ঘরে চলে গেল। টিঙ্কু ফু দিয়ে দিয়ে চা খেতে লাগল। তানাই চায়ের কাপের দিকে তাকাচ্ছিল জুলজুল করে। ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে টিঙ্কু বলল, "তুমি ছেলেমানুষ। চায়ে লোভ দিও না। বড় হলে খেতে দেব।"

কথাটা শেষ হতে না হতেই নিজের ঘর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে ছোটকা চেঁচিয়ে উঠলেন, "যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড !"

ছোটকার চিৎকারে টিঙ্কুর মা আর বাবা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। "কী ! কী হয়েছে ?"

ছোটকা একই রকমের গলায় উত্তর দিলেন, "মাংসটা শুধুই মাংস নয়, এর মধ্যে ঘুমের ওষুধ মেশানো আছে। এই মাংস খেলে দশ-বারো ঘণ্টার আগে কুকুরটার ঘুম ভাঙত না কিছুতেই।"

ছোটকার কথায় টিঙ্কুর বাবা-মা'র চোখমুখ থমথমে হয়ে উঠল। টিঙ্কু নিজেও কম অবাক হল না, শুধু-শুধু তানাইকে ঘুম পাড়িয়ে কার কী লাভ ! জিজ্ঞেসও করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ছোটকা বললেন, "চোর এসেছিল বাড়িতে। তানাইকে ঘুম পাড়িয়ে চুরি করত। কিন্তু কুকুরটার সিক্সথসেন্স দারুণ, ও ঠিক বুঝে গেছে খাবারের মধ্যে গোলমেলে কিছু একটা আছে, তাই অত চিৎকার···"

টিঙ্কুর মার চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল, কী যেন বলতে গিয়ে কিছুই বলতে পারলেন না। টিঙ্কুর বাবা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, "ভয়ংকর ব্যাপার ! এ এলাকায় এভাবে চুরি করার কথা আগে কখনও শুনিনি তো ! সকালেই থানায় যাব। তুমি মাংসের টুকরোটা রেখে দিও, দারোগাবাবুকে দেখাতে হবে।"

টিঙ্কু ছোটকার ঘরে ঢুকে ভয়ংকর ওই মাংসের টুকরোটা দেখে এল। মা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বললেন, "খাটের তলা-টলাগুলো একবার দেখে এলে হয় না ?"

বাবা ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, চোররা এই সকালে ধরা দেবার জন্য খাটের তলায় বসে আছে।"

বাবার কথায় আকাশের দিকে চোখ গেল টিঙ্কুর। পরিষ্কার একটা ভোর, আকাশে পাখি উড়তে শুরু করেছে। দিনের বেলায় চোর-ডাকাতের ভয় বোধহয় কাউকেই তেমন চেপে ধরে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টিঙ্কু আকাশ-পাতাল অনেক কিছু ভেবে ফেলল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। আর একটু বেলা বাড়তেই টিঙ্কুর কাজের দিন শুরু হয়ে গেল। মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে যাওয়া, ফিরে এসে তৈরি হয়ে স্কুলে যাওয়া।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে টিঙ্কু শুনল থানার দারোগা এসেছিলেন বাড়িতে। সারা বাড়ি, ছাত ভালভাবে দেখেশুনে বলে গেছেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। নাইট-গার্ড এবার থেকে নজর রাখবে এ-বাড়ির ওপর।

রোজ বিকেলে সাহেবের বাড়ি যাওয়া কেমন যেন একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গেছে টিঙ্কুর। সাহেব দারুণ ভাল গল্প করতে পারে, আর বেশির ভাগ গল্পই কুকুরদের নিয়ে। তার ওপর কাল আবার নানান রকম খেলা দেখিয়ে তানাই তাক লাগিয়ে দিয়েছে সাহেবকে। ছাত্রের সাফল্যে মাস্টারমশাইয়ের আনন্দ তো হবেই। অ্যাদ্দিন ধরে তানাইয়ের পিছনে ও কম খাটেনি। যাক, ওর মুখ রেখেছে তানাই।

চটপট জলখাবার খেয়ে তানাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে টিঙ্কু বলল, "সাহেবের বাড়ি যাবি নাকি আবার ?"

তানাই ছোট দুটো লাফ দিয়ে লেজ নাড়তে-নাড়তে টিঙ্কুর কথায় সায় দিল। তারপর দুজনেই ছুট লাগাল সাহেবের বাংলোর দিকে।

প্রতিদিন সাহেব এই সময় বাংলোর বাগানে বেতের চেয়ারে বসে থাকে। আজও ছিল। সাহেবের চারদিকে কুকুরগুলো। টিঙ্কু আর তানাইকে দেখে কুকুরগুলো ঘাউ-ঘাউ করে

সারা অঙ্গে কোমলতার পরশ

এখন স্নানের পরে এক
কোমলতার নতুন অনুভূতির
জগতে প্রবেশ করুন।
নতুন পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম
সাবানের সমস্ত গুণই ছড়িয়ে
পড়বে আপনার সারা অঙ্গে...
আপনার ত্বককে করে তুলবে
মোলায়েম ও কোমল।

নতুন
পণ্ডস্
কোল্ড ক্রীম সাবান
পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীমের
সমস্ত গুণে ভরা

OBM/3920/BN

অভ্যর্থনা জানাল। একটু হেসে হাত তুলল সাহেব।

তানাইয়ের সঙ্গে সাহেবের কুকুরগুলোর বেশ ভাব হয়ে গেছে, সুতরাং বাগানে ঢুকতে তানাইয়ের আজ আর ভয় করল না। সামনের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে টিঙ্কুকে বসতে বলল সাহেব। সাহেবের কুকুরগুলো টিঙ্কুকে একবার শুঁকে নিয়ে তানাইকে ঘিরে দাঁড়াল। টিঙ্কু আড়চোখে দেখল, কুকুরগুলোর চোখে বেশ সমীহ করার ভাব। ওদের চোখ দেখে টিঙ্কু পরিষ্কার বুঝতে পারল, তানাইকে ওরা কুকুর-সমাজের কেউকেটা ভেবে নিয়েছে।

সাহেব একটু লাজুক মুখে টিঙ্কুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কাল তুমি আমার ওপর একটু চটে গিয়েছিলে, না?"

"আরে ন্না, কী আশ্চর্য! চটে যাওয়ার মতো কোনো ঘটনাই তো ঘটেনি কাল।"

সাহেব স্বস্তির চিহ্ন চোখেমুখে ফুটিয়ে বলল, "যাক, তুমি অফেণ্ডেড হওনি, এটা আমার পক্ষে আনন্দের কথা। আসলে কাল আমি যা বলেছিলাম সে-সব নেহাতই কথার কথা, প্লিজ ডোণ্ট টেক ইট আদারওয়াইজ।"

সাহেবের কথায় রীতিমত লজ্জা পেয়ে গিয়ে টিঙ্কু বলল, "বিশ্বাস করো, সত্যিই আমি কিছু মনে করিনি।"

কালকের ওই বাজে ব্যাপারটা ভুলিয়ে দেবার জন্যই সাহেব বোধহয় আজ খাবারদাবারের বিরাট আয়োজন করেছিল। আফজল প্লেটের পর প্লেট সাজাতে লাগল টেবিলের ওপর। দারুণ-দারুণ সব খাবার, আর প্রতিটি খাবার থেকেই জিভে জল এনে দেবার মতো গন্ধ বার হচ্ছিল।

টিঙ্কু চোখ কপালে তুলে বলল, "এ তো দেখছি বিশাল ফিস্ট।"

সাহেব বলল, "না-না, সামান্য আয়োজন, বাট ইউ মাস্ট ইট অল।"

টিঙ্কু হাসতে হাসতে বলল, "নো, নেভার, উই অল শেয়ার ইট।"

যে কথা সেই কাজ, দুজন মানুষ আর আটটা কুকুর সব খাবার ভাগাভাগি করে খেয়ে নিল। ভাল খাবার খেলে সবার মনেই বেশ ফুর্তি আসে। ফুর্তিতে সাহেব শিস দিল, টিঙ্কু গুনগুন করল, আর আটটা কুকুর আটরকম গলায় ঘেউ-ঘেউ করল একসঙ্গে।

সাহেব পাইপ ধরিয়ে বলল, "বাই দ্য ওয়ে, কাল তুমি চলে যাবার পরে আমি মেরিটোরিয়াস কুকুরদের কেস-হিস্ট্রি পড়লাম কয়েকটা। হাইলি ইনটারেস্টিং। একটা কেস-হিস্ট্রিতে দেখলাম অথার লিখেছে, অল্পবয়সী কুকুরদের মধ্যে কেউ-কেউ দারুণ বুদ্ধিমান হয়, কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। সুতরাং তোমার তানাইকে নিয়ে এখনই খুব একটা মাতামাতি কোরো না, একটু বয়েস বাড়ুক তারপর বোঝা যাবে সত্যিই ও..."

কোন্ কথা কোথায় গিয়ে দাঁড়াল! টিঙ্কু স্পষ্ট বুঝতে পারল, সাহেব কালকের অপমান এখনও হজম করতে পারেনি। কিন্তু এটাকে সাহেব অপমান হিসেবেই বা নিচ্ছে কেন? বেশি বুদ্ধিমান হওয়া কি কারও অপরাধ! আসলে সামান্য একটা দেশী কুকুরের কাছে সাহেব-কুকুরদের হেরে যাওয়াটা সাহেব একেবারেই সহ্য করতে পারছে না। সাহেবের মনের কথাগুলো আন্দাজ করে নিয়ে টিঙ্কু বলল, "হ্যাঁ, তানাই তো একেবারেই ছেলেমানুষ, বয়েস বাড়লে ওর এত বুদ্ধি থাকবে কি না কে জানে!"

টিঙ্কুর কথায় সাহেবের বোধহয় জ্বালা মিটল কিছুটা, কিন্তু খোঁচা দেবার লোভ সাহেব এখনও ছাড়তে পারেনি। দাঁতের ফাঁকে পাইপ কামড়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "তোমার কুকুরটা নেহাতই ডোমেস্টিক ডগ, এইসব কুকুরের বুদ্ধি যতই হোক না কেন এদের নার্ভ কক্ষনো স্ট্রং হয় না।"

খোঁচাটা হজম করতে গিয়েও পারল না টিঙ্কু, তবে অনেক কষ্টে উত্তেজনা সামলে নিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "এরকম মনে হচ্ছে কেন তোমার?"

সাহেব সবজান্তার হাসি হেসে বলল, "কুকুরের চেহারা দেখলেই আমি ধরতে পারি।"

"তানাইকে দেখলে কি মনে হয় ওর নার্ভ উইক?"

"হ্যাঁ, ওর ফিচার তো সেই কথাই বলে। আমার কুকুরদের নার্ভ খুব স্ট্রং, আর নার্ভ স্ট্রং বলে ওরা শিকার করতে পারে, শিকারির সঙ্গী হতে পারে।"

টিঙ্কু এবার আর ওর উত্তেজনা গোপন করতে পারল না। খসখসে গলায় বলল, "শিকার ধরার ট্রেনিং দিলে তানাইও শিকারি হতে পারবে।"

সাহেব চোখেমুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে বলল, "ওহ্ নো, শিকারি কুকুর হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।"

টিঙ্কু এক হাতের ওপর আর এক হাত চাপড়ে বলল, "ইশ্! বললেই হল। তানাই সব পারবে।"

সাহেব দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে স্নেহের হাসি হেসে বলল, "টিঙ্কু, এটা গায়ের জোরের কথা নয়, কেউ তার স্বভাবের বাইরে যেতে পারে না, নান্।"

টিঙ্কু একটু রাগী-রাগী গলায় বলল, "তানাইয়ের স্বভাব বোঝা অত সহজ নয়।"

"আমার পক্ষে সহজ, আমি তিন পুরুষের প্রোফেশনাল ডগ-ট্রেনার।"

"আমিও এক পুরুষের ডগ-ট্রেনার।"

টিঙ্কুর কথায় সাহেব হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "বিউটিফুলি সেড। ঠিক আছে, প্রমাণ হয়ে যাক। ওদিকের ওই পাহাড়ের পাশে বিশাল একটা লেক আছে। অনেক পাখি আসে ওখানে। কাল ওখানে শিকার করতে যাব আমি। যাবে তুমি আমার সঙ্গে? তোমার তানাইকেও সঙ্গে নিয়ে নাও।"

"নিশ্চয়ই যাব।" টিঙ্কু বেশ জোরের সঙ্গে উত্তর দিল।

"সারাদিন থাকতে হবে কিন্তু, তোমার বাবা-মা রাজি হবেন তো?"

"হ্যাঁ হবেন, আমি রাজি করিয়ে ছাড়ব। কাল তো আমাদের হলিডে, স্কুল নেই।"

পাইপের ছাই অ্যাশট্রের মধ্যে উপুড় করে দিয়ে সাহেব বলল, "ঠিক আছে, কাল আমরা সকাল ছটায় রওনা হব। তুমি তাহলে আমার বাংলোয় চলে এসো, শার্প অ্যাট সিক্স।"

"ঠিক আছে, আসব।" বিরাট একটা উত্তেজনা বুকের মধ্যে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল টিঙ্কু।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

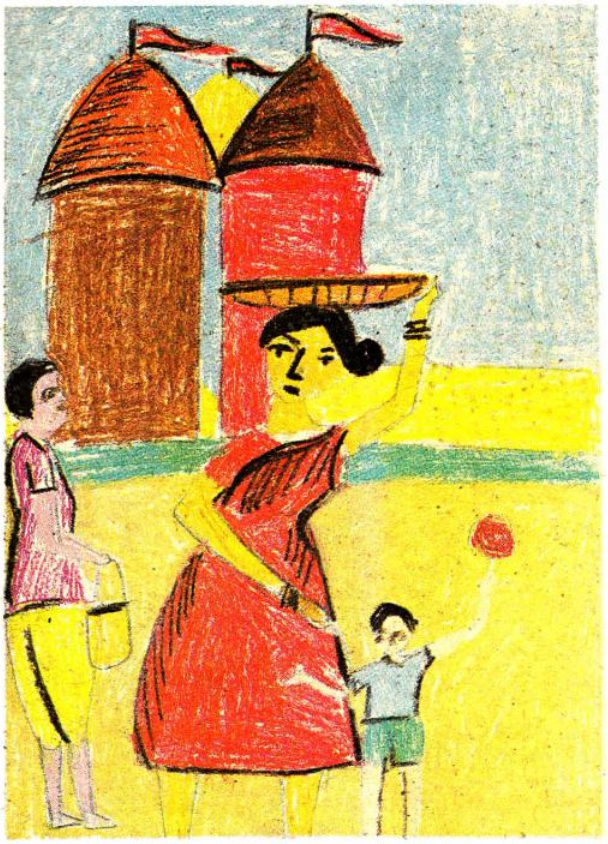

ছবি এঁকেছে **অরুণাভ বিশ্বাস** (বয়স ৮)

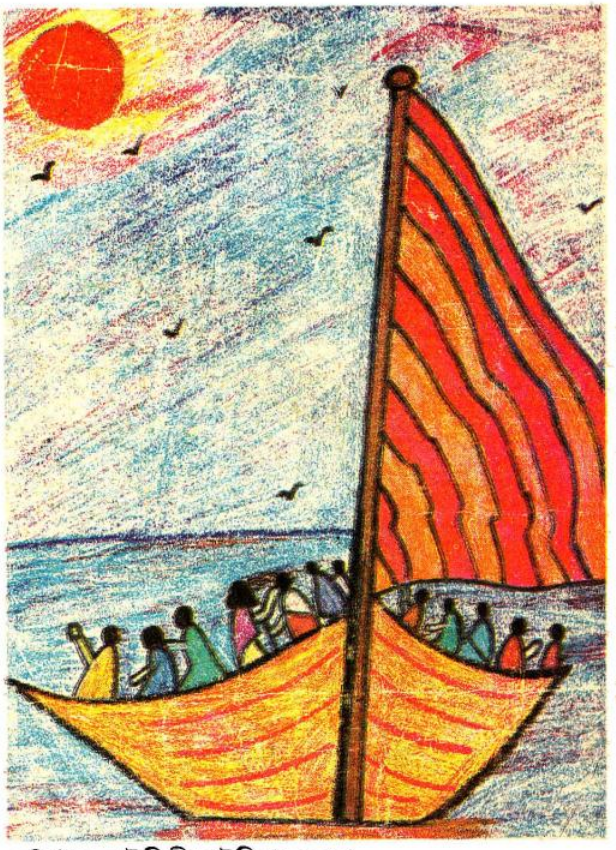

ছবি এঁকেছে **ঈশিত্রী মাইতি** (বয়স ৯)

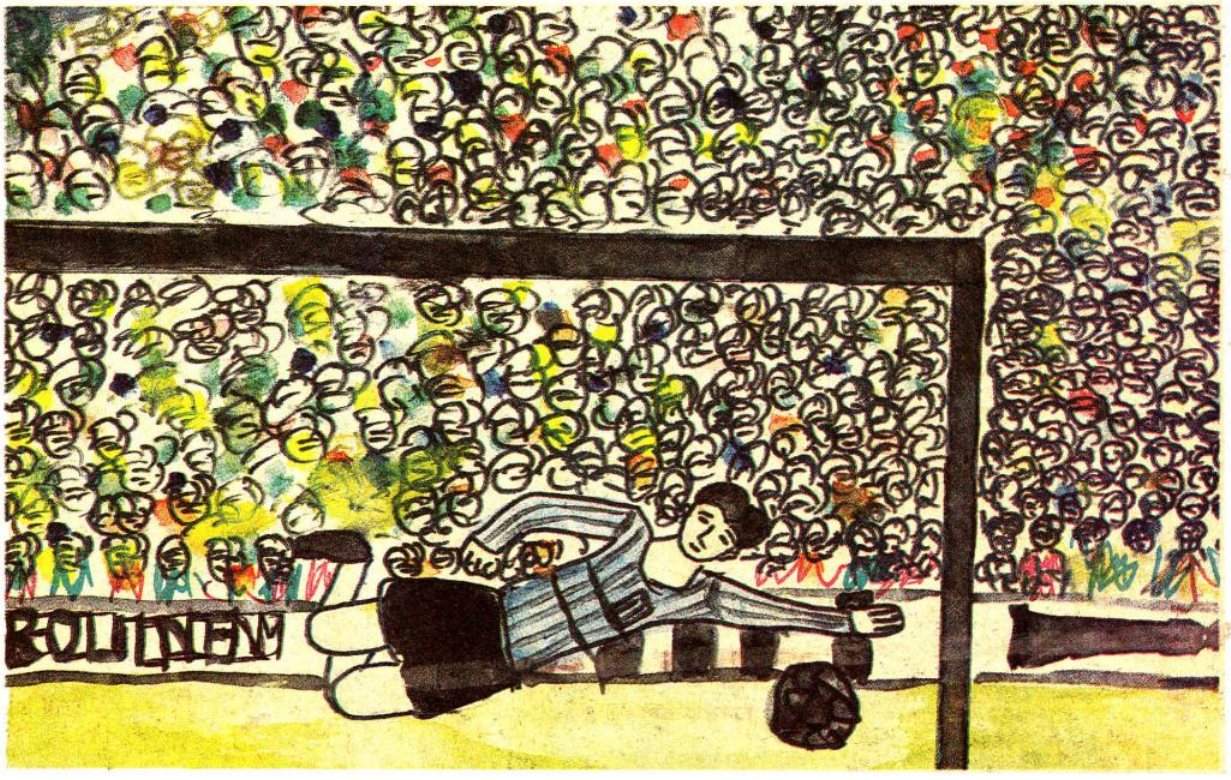

ছবি এঁকেছে **দেবরাজ পাল** (বয়স ১১)

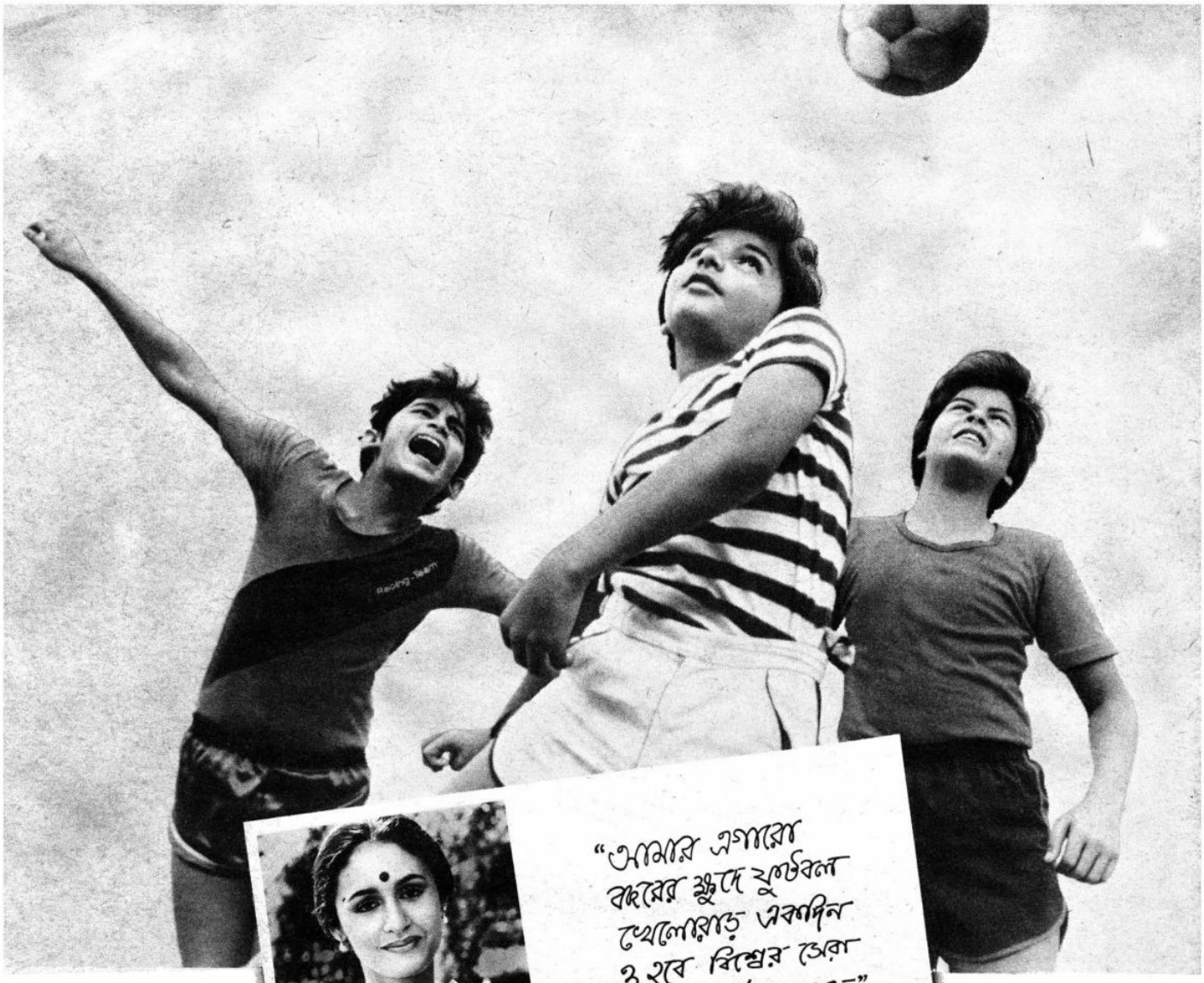

"আমার এগারো
বছরের ক্ষুদে ফুটবল
খেলোয়াড় একদিন
ও হবে বিশ্বের সেরা
ফারোয়ার্ড প্লেয়ার—"

বোর্নভিটাভরা বর্ষগুলি

যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে তাদের কৃতজ্ঞতা।

বাড়ন্ত বাচ্চারা, অন্য আর সব মল্টেড পানীয়ের মধ্যে বোর্নভিটা-ই কেন সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে ? কেন দু'পুরুষ ধরে মা বাবারা জোরের সঙ্গেই বলেন। তাদের বাচ্চাদের অন্য কোন পানীয়তে কাজ হবে না ?

এশুধু এটির মজাদার স্বাদের জন্যে নয়। এমন কি ক্যাডবেরিস্ নামটির জন্যেও নয়। এর কারণ অন্য কিছু। বিশেষ কিছু। এ হ'ল বোর্নভিটা, যে পানীয়ের গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো।

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
পালন-পোষণ সঠিকভাবে করুন,
বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান।

ওষ্ঠবক্র রহস্য

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : হুইটনির খোঁজে আফিমের আড্ডায় ঢুকে ছদ্মবেশী হোম্‌সের দেখা পায় ওয়াটসন। হোম্‌স খুঁজছে নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে। নেভিল এই আড্ডা থেকে নিখোঁজ হন। ওয়াটসনকে নিয়ে নেভিলের বাড়ির দিকে যেতে-যেতে হোম্‌স জানায়, ঘটনার দিন নেভিল লণ্ডনে যাবার সময়ে বলেছিলেন, ছেলের জন্য খেলনা নিয়ে ফিরবেন। পরে মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ারও লণ্ডনে আসেন, এবং সোয়ানডাম লেন ধরে হাঁটবার সময় দেখতে পান যে, আফিমের আড্ডার বাড়িটির দোতলার জানালা থেকে তাঁর স্বামী উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে তাঁকে কিছু জানাবার চেষ্টা করছেন। পুলিশ সেই বাড়িটিতে ঢুকে অবশ্য নেভিলকে দেখতে পায় না। কিন্তু ঘরে সেই খেলনাটা পাওয়া যায়। একজন বিকলাঙ্গ মানুষকেও দেখা যায় সেখানে। বাড়ির পাশে নদী। নেভিলকে কি খুন করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে? নদীর কাদায় পাওয়া গেছে নেভিলের কোটটিও। তারপর ...

॥ ৩ ॥

শার্লক হোম্‌স যখন তার অদ্ভুত কেসের কথা আমাকে শোনাচ্ছিল, তখন আমরা শহর ছাড়িয়ে পল্লী অঞ্চলে এসে পড়েছি। এইমাত্র আমরা দুটো ছোট গ্রামের পাশ দিয়ে এসেছি। এখন কিছু দূরে বেশ কিছু আলো দেখা যাচ্ছে। বুঝলুম, আমরা কোনও বড় জায়গার কাছাকাছি চলে এসেছি।

হোম্‌স বললে, "আমরা এখন লিয়ের কাছে এসে পড়েছি। এইটুকু পথ আসতে আমরা তিনটে কাউণ্টির মধ্যে দিয়ে এসেছি। প্রথমে মিডলসেক্স, তারপর সারের কোণ ঘেঁষে, আর সবশেষে কেণ্ট। ওই গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ? ওইটে হল সেডার্স। ওখানে একটা জানলার ধারে বসে মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ ওঁর কানে গেছে।"

"কিন্তু এই তদন্তটা তুমি বেকার স্ট্রিটের বাড়ি থেকে করছ না কেন?" আমি হোম্‌সকে জিজ্ঞেস করলুম।

"তার কারণ, বেশ কিছু অনুসন্ধান এখান থেকেই করতে হবে। মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার আমাকে দুটো ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। আর আমার বন্ধু ও সহকারী হিসেবে তিনি যে তোমার আসাতে খুবই খুশি হবেন সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমি বলছি তোমার আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হবে না। বুঝলে ওয়াটসন, তাঁর সামনাসামনি হতে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, বিশেষত তাঁর স্বামীর কোনো খবরই যখন আমি আনতে পারছি না। এই আমরা এসে পড়েছি।"

আমরা একটা বড় ভিলা-ধরনের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালুম। বাড়িটা একটা প্রকাণ্ড বড় বাগানের মাঝখানে। আমাদের গাড়ি থামতেই একজন সহিস ছুটে এল। আমি হোম্‌সের পেছনে-পেছনে নুড়িঢালা পথ দিয়ে বাড়িটার সদর দরজার দিকে এগোলুম। আমরা সদর দরজার কাছে আসতেই দরজা খুলে দিলেন ছোটখাটো চেহারার এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা।

"কী, কী হল?" তিনি ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন। তারপরই দুটি লোককে আসতে দেখে তাঁর মুখ থেকে একটা আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সঙ্গীর হতাশভাবে মাথা নাড়া দেখে ভদ্রমহিলা ফের মুষড়ে পড়লেন।

"কোনো সুসংবাদই নেই!"

"না।" হোম্‌স উত্তর দিলে।

"কোনো খারাপ খবর আছে কি?"

"না, তাও নেই।"

"ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আসুন, ভিতরে আসুন। সারাদিন বিস্তর খাটাখাটনি করে আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত।"

"ইনি আমার বন্ধু ওয়াটসন। আমার অনেক তদন্তে ইনি আমাকে সাহায্য করেছেন। আজ হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে এঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ইনি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন।"

আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে তিনি বললেন, "আপনি আসাতে আমার সত্যিই খুব আনন্দ হয়েছে। আশা করি এখানে থাকতে আপনার কষ্ট হবে না। যদি কিছু অসুবিধে হয় তো আমার অবস্থার কথা ভেবে আপনি সেটুকু ক্ষমা করবেন।"

আমি তাঁকে বললুম, "সে ব্যাপারে আপনার বিচলিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার যদি কোনো উপকারে আসতে পারি, তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

তারপর ভদ্রমহিলা আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের সব আলো জ্বলছে। টেবিলের ওপর রাত্রের খাবার সাজানো রয়েছে।

ভদ্রমহিলা শার্লক হোম্‌সকে লক্ষ করে বললেন, "দেখুন মিঃ হোম্‌স, আমি আপনাকে একটা কথা খোলাখুলি জিজ্ঞেস করতে চাই। আশা করি আপনি আমাকে তার সোজাসুজি উত্তর দেবেন।"

"নিশ্চয়ই দেব।"

"আপনি আমার কথা ভাববেন না। আমার মন খুব শক্ত। আমি সহজে বিচলিত হই না। আমি আপনার নিজের মত শুনতে চাই। ভয় পাবেন না। আমি চিৎকার-চেঁচামেচি করব না বা অজ্ঞান হয়ে পড়ব না।"

"কোন্ ব্যাপারে আপনি আমার মত জানতে চান?"

"আপনি কি সত্যি-সত্যি মনে করেন যে, মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ার বেঁচে আছেন?"

আমার মনে হল প্রশ্নটা শুনে শার্লক হোম্‌স একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। "বলুন মিঃ হোম্‌স। চুপ করে থাকবেন না।"

"সত্যি কথা বলতে কী, তিনি বেঁচে আছেন বলে আমার

NP

Dubbleyum

PRESENTS

A NEW WORLD OF LOVE & ADVENTURE
FUN & FROLIC!

Look for the LUCKY COUPON in

NP

Dubbleyum Packet

COLLECT

One latest comic book for **12** lucky coupons
or
The latest edition of Enid Blyton or Mills & Boon novel for **30** lucky coupons

DOUBLE COLOURS
DOUBLE FLAVOURS
DOUBLE SIZE AND
BIGGER BUBBLES

NP Dubble yum
SOFT & JUICY BUBBLE GUM

The National Products
BANGALORE-32

NOTHING CAN BEAT A NP BURST OF FROLIC

মনে হয় না।"

"আপনার বিশ্বাস তিনি মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি কি খুন হয়েছেন?"

"তা জানি না। তবে তাই হওয়া সম্ভব।"

"কবে তিনি খুন হয়েছেন বলে আপনার ধারণা?"

"সোমবার।"

"তাহলে মিঃ হোম্‌স, আপনি কি আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন যে, কী করে তাঁর লেখা চিঠি আজকে আমি পেলুম?"

শার্লক হোম্‌স চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। মনে হল তার শরীর দিয়ে যেন প্রচণ্ড একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল।

"কী বললেন?" শার্লক হোম্‌স চেঁচিয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, আজকেই চিঠি পেয়েছি।" ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে একটা খাম তুলে ধরলেন।

"আমি কি চিঠিটা দেখতে পারি।"

"নিশ্চয়ই।"

ভদ্রমহিলার হাত থেকে চিঠিটা একরকম খপ্ করে কেড়ে নিয়ে হোম্‌স খামটা টেবিলের ওপর রাখলে। তারপর আলোটা সরিয়ে এনে খামটা খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলে। আমি আমার চেয়ার থেকে উঠে এসে তার পেছনে দাঁড়ালুম। শস্তার মোটা পুরু খাম। খামের ওপর গ্রেভ্‌স এণ্ড পোস্ট আপিসের ছাপ। আজকেরই তারিখ। তবে এখন বোধহয় কালকের তারিখ বলা উচিত, কেননা রাত বারোটা অনেকক্ষণ আগে বেজে গেছে।

"অপরিষ্কার কাঁচা হাতের লেখা," হোম্‌স বললে। "এটা নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর হাতের লেখা নয়।"

"না। কিন্তু ভেতরের চিঠিটা তাঁর হাতের লেখা।"

"আমি বলতে পারি খামের ওপর ঠিকানাটা যে লিখেছে, তাকে খোঁজ-খবর করে ঠিকানা জেনে লিখতে হয়েছে।"

"সেটা আপনি কী করে বলছেন?"

"দেখুন নামটা কালো কালিতে লেখা। কিন্তু ঠিকানার বাকি অংশটা একটু ছাই রঙের। তার কারণ হচ্ছে নামটা লেখবার পর কালিটা আপনা-আপনি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু ঠিকানার কালিটা ব্লটিং দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদি ঠিকানা আর নাম একসঙ্গে লেখা হত তাহলে কালির রঙে এই তফাত হত না। খামের ওপর নামটা লেখবার পর, বেশ কিছুক্ষণ পর, সে ঠিকানাটা লিখেছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, ঠিকানাটা তার জানা নেই। যাই হোক এটা একটা খুব সামান্য ব্যাপার। তবে এই সামান্য ব্যাপারগুলো কখনও-কখনও ভীষণরকম জরুরি হয়ে ওঠে। এবার চিঠিটা দেখা যাক। চিঠিটার সঙ্গে আর একটা কী ছিল দেখছি।"

"হ্যাঁ, তার শিলমোহর করবার আংটিটা ছিল।"

"আপনি নিশ্চিত যে এটা তাঁরই হাতের লেখা।"

"হ্যাঁ, ওঁর এক ধরনের লেখা।"

"এক ধরনের লেখা, মানে?"

"উনি যখন তাড়াতাড়ি লেখেন তখন ওঁর লেখাটা এইরকম হয়ে যায়। এটা ওঁর সাধারণ হাতের লেখার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে আমি জোর করে বলছি, এ হাতের লেখা ওঁরই।"

চিঠিটা এইরকম :

"কল্যাণীয়াসু,

ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে একটা খুব বড় রকমের ভুল হয়েছে। ঠিকঠাক করতে কিছু সময় নেবে। ধৈর্য ধরো। ইতি নেভিল।"

"চিঠিটা একটা অকটেভো আকারের বইয়ের পুস্তানিতে পেনসিল দিয়ে লেখা। কাগজে কোনো জলছাপ নেই। চিঠিটা আজকেই গ্রেভস এণ্ড থেকে ফেলা হয়েছে। যে ফেলেছে তার বুড়ো আঙুলে ময়লা লেগেছিল। খামটা থুতু দিয়ে আটকানো হয়েছে। যে জুড়েছে সে তামাকপাতা চিবোয়।... আর এ চিঠি যে আপনার স্বামীর লেখা সে-বিষয়ে আপনার মনে কোনও সন্দেহই নেই?"

"না। এ চিঠি তাঁরই লেখা।"

"আর চিঠিটা আজই গ্রেভস এণ্ডে ফেলা হয়েছে। মিসেস ক্লেয়ার, মেঘ কাটতে শুরু করেছে, তবে বিপদ যে একদম কেটে গেছে তা বলব না।"

"কিন্তু, মিঃ হোম্‌স, তিনি তো নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন।"

"হ্যাঁ, যদি না অবশ্য আমাদের ভুল দিকে চালাবার জন্যে এই চিঠিটা কেউ জাল করিয়ে থাকে। আংটিটা অবশ্য কিছু প্রমাণ করে না। ওটা তিনি নিজেও দিয়ে থাকতে পারেন অথবা কেউ জোর করে কেড়ে নিয়েও থাকতে পারে।"

"না, না। এটা নিশ্চয়ই তাঁরই হাতের লেখা।"

"ভাল কথা। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে এটা সোমবারেই লেখা হয়েছিল, কিন্তু ফেলা হয়েছে আজকে।"

"তা অবশ্য হতেও পারে।"

"তা যদি হয় তবে এই কদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটাই

সম্ভব।"

"না, মিঃ হোম্‌স, আপনি এ-কথা বলবেন না। আমার মন বলছে তিনি সুস্থ আছেন।"

"আমি অনেক দেখেছি মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার। আমি জানি মানুষের মন অনেক সময় এমন অনেক সত্য জানতে পারে যা বিচার আর বুদ্ধির বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না। আর এই চিঠিটা অবশ্য আপনার মনে হওয়ার পক্ষে মস্ত বড় একটা প্রমাণ। কিন্তু যদি আপনার স্বামী সুস্থ থাকেন, তবে কেন তিনি এরকমভাবে আপনাদের থেকে আলাদা থাকছেন?"

"অনেক ভেবেও আমি এর কোনও সদুত্তর পাচ্ছি না মিঃ হোম্‌স।"

"আচ্ছা, সোমবার দিন এখান থেকে যাবার আগে তিনি কি এমন কথা বলেছিলেন যে, তাঁর ফিরতে দিন কয়েক দেরি হবে।"

"না।"

"আচ্ছা, সোয়ানডাম লেনে তাঁকে দেখে আপনি কি আশ্চর্য হয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, খুবই আশ্চর্য হয়েছিলুম।"

"ঘরের জানলাটি খোলা ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তিনি কি আপনাকে দেখতে পেয়ে ডেকেছিলেন?"

"হ্যাঁ, তাই আমার মনে হয়েছিল।"

"আমি শুনেছি যে তিনি গলা থেকে একটা অর্থহীন শব্দ করেছিলেন মাত্র।"

"হ্যাঁ।"

"আপনার মনে হয়েছিল তিনি সাহায্যের জন্যে ডেকেছিলেন?"

"হ্যাঁ। তিনি হাত নাড়ছিলেন।"

"কিন্তু এও তো হতে পারে যে, তিনি হঠাৎ ওই জায়গায় আপনাকে দেখে এতই আশ্চর্য হয়েছিলেন যে, তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে আওয়াজ করেছিলেন, আর ওই বিস্ময়ের ঘোরেই তিনি হাত তুলেছিলেন?"

"এটা সম্ভব।"

"আপনার মনে হয়েছিল তাঁকে পেছন থেকে ধরে কেউ যেন টেনে সরিয়ে নিল?"

"হ্যাঁ, এমনভাবে হঠাৎ তিনি ওইখান থেকে সরে গেলেন যে, আমার সেইরকমই মনে হয়েছিল।"

"তিনি হয়তো পেছনদিকে সরে গিয়েছিলেন। আচ্ছা, ওই ঘরে আপনি আর কাউকে দেখেননি?"

"না, তবে ওই বিচ্ছিরি দেখতে লোকটা নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে ওই ঘরের মধ্যে ছিল আর ম্যানেজার ছিল সিঁড়ির গোড়ায়।"

"ঠিক বলেছেন। আচ্ছা, আপনার স্বামী কি সাধারণ পোশাকই পরেছিলেন?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাঁর টাই বা জামার কলার ছিল না। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, আমি তাঁর খালি গলা দেখেছিলুম।"

"আচ্ছা, তিনি কি আগে কখনও সোয়ানডাম লেনের কথা আপনাকে বলেছিলেন?"

"না।"

"আচ্ছা, তিনি কি আফিমসেবী ছিলেন?"

"না।"

"ঠিক আছে, মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার। এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর জানার খুব প্রয়োজন ছিল। এখন আমরা রাত্রের খাওয়া সেরে বিশ্রামের আয়োজন করব। কাল সারাদিনটাই খুব ব্যস্ততার মধ্যে হয়তো কাটবে।"

বিরাট একটা সাজানো-গোছানো ঘর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরের মধ্যে দুটো শোবার খাট। আজকের নৈশ অ্যাডভেঞ্চারের পর আমি খুব ক্লান্তি অনুভব করছিলুম, তাই কালবিলম্ব না করে শুয়ে পড়লুম। শার্লক হোম্‌স এমনই লোক যে, যখন তার মনের মধ্যে কোনও সমাধান-না-করা রহস্যের খবর আসে তখন সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কখনও এক সপ্তাহেরও বেশি সময় বিশ্রাম না করে থাকতে পারে। তখন সে প্রতি মুহূর্তে ওই ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে থাকে, যতক্ষণ না সে একটা সমাধানের সূত্র খুঁজে পায় অথবা সে স্থিরনিশ্চিত হয় যে, তার হাতে যে-সব সূত্র আছে তা সমস্যার সমাধানের জন্যে যথেষ্ট নয়। আমি বুঝতে পারলুম যে, হোম্‌স সারা রাত্রি বসে বসেই কাটিয়ে দেবে। কোট আর ওয়েস্টকোটটা খুলে রেখে সে একটা ঘন নীল রঙের ড্রেসিং-গাউন গায়ে চাপিয়ে নিলে। তারপর বালিশ আর কুশনগুলো এক জায়গায় জড়ো করে একটা সিংহাসনের মতো করে নিয়ে তার ওপর পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে পড়ল। সামনে একটা ছোট টেবিলে তার পাইপ, তামাক আর দেশলাই সাজানো। ঘরের অস্পষ্ট আলোয় আমি দেখলুম হোম্‌স একটা পুরনো ব্রায়ার পাইপে তামাক পুরে আগুন ধরিয়ে টানছে। আর, নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ভাসছে। তার চোখ খোলা। আমার মনে হল যে, সে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বটে কিন্তু কিছুই তার চোখে পড়ছে না। আমি একসময় ঘুমিয়ে পড়লুম।··· হঠাৎ একটা চিৎকারে যখন আমার ঘুম ভাঙল দেখলুম হোম্‌স তখনও ঠিক একই ভাবে বসে আছে। সূর্যের আলো এসে ঘরে পড়েছে। তবে সারা ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি। টেবিলের দিকে তাকালুম। আগের রাতের তামাকের বাণ্ডিলের একটা টুকরোও নেই।

"কী ওয়াটসন, ঘুম ভাঙল?" হোম্‌স প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ।"

"সকালবেলায় ঘোরাঘুরি করতে রাজি আছ কি?"

"নিশ্চয়ই।"

"তাহলে চটপট তৈরি হয়ে নাও। যদিও এ-বাড়ির কেউই এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি, তবে সহিসরা কোথায় থাকে আমার তা জানা আছে। গাড়ি যোগাড় করতে কিচ্ছু অসুবিধা হবে না।"

লক্ষ করলুম, হোম্‌স কথা বলতে বলতে বেশ মুচকি-মুচকি হাসছে। তার চোখও খুশিতে চকচক করছে। এ যেন কাল রাত্তিরের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত গম্ভীর লোকটি নয়, অন্য আর কেউ। জামা পরতে পরতে ঘড়ি দেখলুম। চারটে বেজে পঁচিশ। তাই বাড়ির লোকরা যে এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি তৈরি হবার আগেই হোম্‌স এসে খবর দিলে গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ মুহূর্তে কি মন পালটে গেল দুলালের ?

বোম্বেটে ভাগ্‌নে

মিলন গঙ্গোপাধ্যায়

দেগঙ্গা হাটে সবচেয়ে বড় যে মিষ্টির দোকান তার মিষ্টির তুলনা হয় না। খাস্তা গজা, পান্তুয়া, ছানার মুড়কি। মনে পড়লেই জিভে জল আসে দুলালের। দুলালের মামা বোম্বেওলারও। মামার আসল নামটা আজ আর কেউ জানে না। বোম্বেতে কী একটা কারবার ছিল, বছরে ন-মাস কাটাতেন সেখানে। তাই গ্রামে ওই নামেই পরিচিত। অবিশ্যি এতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। বরং বেশ গর্বই হয়। গর্ব দুলালেরও। কারণ, অনেকেই বলে—বোম্বেওলা মামার বোম্বেটে ভাগ্‌নে।

ইস্কুল, পড়াশুনো কোনোদিন ভাল লাগেনি। গোরু চান করানো, দুধ দোওয়া, নারকেল গাছে বুক না ঠেকিয়ে তরতর করে উঠে যাওয়া—এ সব কাজই দুলালের পছন্দ। আর ভাল লাগে মামার সঙ্গে দেগঙ্গা, পদ্মপুকুর, ঝাঁপা, সোহাই, হাটে-হাটে ঘুরে বেড়াতে। বোম্বের ব্যবসা গুটিয়ে বোম্বেওলা কার্তিকপুরে যে বাড়িখানা বানিয়েছেন, তা সামলাবার লোক চাই। চোর-ডাকাতের ভয়ে দিনভর দুশ্চিন্তা, রাতে ঘুম নেই। ঘুম নেই বলা ভুল হবে। সন্ধেরাতেই দরজায় খিল এঁটে বিছানায় গেলে মাঝরাতেই ঘুম কাবার। বাকি রাতটা এপাশ-ওপাশ করে কাটানো। বয়েস বাড়লে ঘুমও পালায়।

দুলালের ঘুম যেন কাঁচের বাসন। টুক করলেই ঝন-ঝনাত্। সঙ্গে সঙ্গে "কেঁ—এ—টা ?" ঘুমচোখে জড়ানো গলায় হুঙ্কার। এ-ভাষা দুলালের নিজস্ব। দুলালের সুরে সুর মেলায় তার পোষা কুকুর—"কেঁ—এ—উয়া। ঘেঁ—এ—উয়া

মামা তখন দেয়াল-ঘড়িতে দেখেন দুটো বাজতে দশ। মামি বলেন, "পাগ্‌লাটার জ্বালায় ঘুমোবার উপায় আছে ?" টর্চ জ্বেলে মামা চারধারটা দেখে নেন। কোণে দুলালের ঘরে টর্চের আলো পড়লে দুলাল থামে। দুলাল যে-ঘরে শোয়, সেখানে বস্তা-বস্তা ধান-চাল, টিন-টিন আখের গুড়, সরষে, মুগকলাই আরও কত কী ! বর্ষায় দরদাম যখন হু-হু করে বাড়বে, তখন এই ঘর খালি হবে। ইঁদুর-ছুঁচোর উৎপাতে সারারাত ঘুমের ব্যাঘাত। তার ওপর মামি মাঝে-মধ্যেই বাঁকা চোখে বলেন, "কী রে ! মালপত্তর সরাচ্ছিস নে তো ?" ইচ্ছে হয় একটা মুখঝামটা দিয়ে মামির কথার জবাব দেয়। কিন্তু জবাব দিলেই পরদিন থেকে হরিমটর ভরসা। কাজ জানা আছে তো মোটে দুটো—গোরু রাখা আর গোরু দোওয়া। যোগ করলে দাঁড়ায় একটা।

মামার চাই একটা কাজের লোক। নিজে কটা দিক দেখবেন ! ধান রোয়া-কাটা-ঝাড়া, আখ বোনা-কাটা-মাড়াই, আলুর খেতে জল দেওয়া, বাগানে চাট্টি সব্জি ফলানো। তা দুলাল, হয় গোরুগুলোর পেছন-পেছন, নয় মামার পেছন-পেছন। মামি এ নিয়ে মাঝে-মাঝেই গজর-গজর করেন। কিন্তু একটা বিশ্বস্ত লোক কোথায় পাওয়া যায়।

হঠাৎ কোত্থেকে হাজির হল লালবিহারী। খুলনার বর্ডার পার হয়ে বাঁকড়া, হিঙ্গলগঞ্জ ঘুরে পাড়াতুতো দিদির বাড়ি। মামি পেয়ে গেলেন মোক্ষম অস্ত্র। লালবিহারী হচ্ছে খাঁটি চাষি। গায়ে-গতরে খাটবে খাবে। দুলালের মতো বাবুয়ানা নেই।

বোম্বেওলা সব শুনলেন। তিনি বিষয়ী মানুষ। তাঁর কাছে মায়া-মমতা পরে, বিষয় আগে। এতদিনে যখন কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া গেল না, এবার বিদায় করে দেওয়াই সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু একটা ছুতো-অছিলা চাই তো। শুধু-শুধু তাড়িয়ে দিলে গ্রামের লোকেই বা বলবে কী !

লালবিহারীর শোওয়া-থাকার ব্যবস্থা দুলালের সঙ্গে এক ঘরে। ব্যাপারটা দুলালের ভাল না লাগলেও উপায় কী ! তার মধ্যে লালবিহারী আজ যাত্রা, কাল পুতুলনাচ, পরশু তর্জাগান, অষ্টপ্রহর নামগান শুনতে চলে যায়। চুপি-চুপি ফিরে আসে সেই রাত দুপুরে। উৎকণ্ঠায় দুলালের ঘুম আসে না। মামা যদি জানতে পারে ! লালবিহারী তাকে হাজারটা দিব্যি দিয়েছে, আর দিনরাত্তির কত যে প্রশংসা করে। তা শুনে দুলালের তাকে মনে ধরেছে। একদিন সন্ধেবেলা লালবিহারী পাটের দড়ি পাকাচ্ছে, দুলাল ধরে আছে টান করে। এ-কথায়

সে-কথায় দুলাল বলে বসল মহাদেবের কথা।

পাকা চোর মহাদেব। ঝাঁপা, কার্তিকপুর, ভাসলিয়া, আশপাশের পাঁচটা গাঁয়ের সবাই চেনে, সবাই জানে। এই ক-মাসে লালবিহারী তার নাম শুনেছে ; তার কথা উঠতেই শিউরে ওঠে। বলে, "লোকটাকে একবার দেখাস দিকি। তার নাকি অনেক বিদ্যে জানা আছে!"

"তা আছে। সিন্দুকের তালা, ক্যাশ-বাক্স, শাল-গামারি কাঠের দরজা, যাতে হাত দেয় অমনি চিচিং ফাঁক।"

দুলালের কথা শুনে দড়ি-পাকানো মাথায় লালবিহারী এগিয়ে এসে বলে, "তোরে চেনে?"

"চেনে না আবার! পথেঘাটে বেরোনোর উপায় আছে? একলা দেখলেই ডাকে। যতসব বাজে বুদ্ধি মাথায় ঢোকায়। বড়লোক হওয়ার বুদ্ধি।" মহাদেবের ওপর রাগে দুলাল সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করে। কথাটার অর্থ বুঝতে লালবিহারীর একটুও দেরি হয় না। সে বলে, "তোর মামাবাবুরে কথাটা বলিছিস?"

"না। বলা হয়নি।" এবার দুলাল একটু ভয় পেয়ে লালবিহারীর হাত চেপে ধরে। দিব্যি করায়। "মামা-মামির কানে কথাটা তুলো না। আমারে তাড়িয়ে দেবে।"

পরদিন দুপুরে খাওয়ার পর মামা-মামি দুজনেই দুলালকে ডেকে জেরা শুরু করে দিলেন। "মহাদেব কেন ডাকে? কী পরামর্শ দেয়? কেন এতদিন বলিসনি?" ইত্যাদি।

দুলাল কটমট করে লালবিহারীর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে তখন রোদ্দুরে বসে শিলের গায়ে হাঁসুয়াটা ঘষে ঘষে ধার দিচ্ছিল। একমনে শান দিচ্ছে, যেন কিছুই জানে না। কথার জবাব না দিয়ে চড়াও হল লালবিহারীর ওপর। ভাব-গতিক দেখে মনে হল দুলাল ওই হাঁসুয়া দিয়ে তাকে দু'টুকরো করবে। বোম্বেওলা মামা এক ধমকে না থামাতে পেরে দু-ধমক ; শেষে দিলেন গলাধাক্কা। আপদ গেছে, বাঁচা গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে হাজির দেগঙ্গা হাটে। সেদিন হাটবার। অন্যদিন সে আর মামা একটা সাইকেলভ্যানে চেপে আসে। এটা-সেটা বেচাকেনার পর বড় মিষ্টির দোকানে বসে খাওয়া। তিন-চার রকম মিষ্টি খাওয়া।

মামার হাতে-পায়ে ধরে যদি ব্যাপারটা মেটানো যায়। বসে বসে মামার দেখা মিলল ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে রয়েছে লালবিহারী। মামা দেখেও দেখেন না। সারা হাটে পেছন-পেছন ঘুরঘুর করেও কোনও লাভ হল না। কিন্তু মামা আজ মিষ্টি খেলেন না। কী জানি, সে সঙ্গে নেই, সেজন্যই বোধহয় মনটা খারাপ।

একটা ভ্যানে চেপে মামারা চলে গেলেন। দুলালের মাথা টনটন করছে রাগে, দুঃখে। মিষ্টির দোকানের সামনে টিউবওয়েলের মুখে হাত পেতে খানিক জল খেয়ে নিল। চোখে-মুখে মারল জলের ঝাপটা। চোখ ফেরাতেই দেখে—মহাদেব। সামনের দুটো ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে গা-জ্বালানো হাসি। "ভাগিয়ে দিয়েছে তো? ও আমি আগেই জানতাম। তা এখন কীভাবে চলবে?"

"জানিনে।"

"কাজকম্ম তো কিছুই জানা নেই, খাবি কী? পাগলা!"

"ধ্যাত্। সোজা করে কথা বলো দিকিনি, কী বলতে চাও?"

"চল্। বলছি।"

মহাদেবের পেছন-পেছন দুলাল চলল। হাট-ফেরতা মানুষজন, গোরুর গাড়ি যাচ্ছে। সারি-সারি যাচ্ছে। এরা টমেটোকে বলে টক বেগুন। এবার খুব ফলেছে। মহাদেব থলি থেকে দুটো টক বেগুন দিল দুলালের হাতে। প্যান্টে মুছে কচমচ করে খেয়ে নিল। ক্যাচর-ম্যাচর গোরুর গাড়ি চলছে। গাড়োয়ানরা মহাদেবকে চেনে। তাই গাড়িতে উঠতে দিতে চায় না। বরং মালপত্তর সামলায়। দুটো বাঁক ঘুরতেই মহাদেব নেমে গেল খেতের ভেতরের হাঁটাপথে। পেছন-পেছন দুলালও। ধান কাটা হয়ে গেছে। আড়াআড়ি মাঠ পেরোলেই কালিয়ানি গ্রাম। সবে সন্ধে। দুলালের মনে পড়ল মামাবাড়ির গোরুগুলোর কথা। ওদের গোয়ালে তোলা হল কি না, জাবনা দেওয়া হল কি না।

"অত কী ভাবছিস?"

"মামা যদি আমারে খোঁজে?"

এবার মহাদেব খিঁচিয়ে ওঠে। "খুঁজবে না আরও কিছু! তোরে খাটিয়ে নিয়ে পয়সাকড়ি কিছু দিত?"

"না। তবে ভালমন্দ খাওয়াত।"

"আমি খাওয়াব, পয়সাকড়িও দেব। হাঁদা কোথাকার!"

মহাদেব সত্যিই জাদু জানে। ভালমন্দ খাইয়ে দুলালকে বশ করে ফেলেছে। দিনের বেলা শুধু ঘুম আর খাওয়া। রাতে শোওয়া হয় না। তখন চলে শিক্ষা। একদিনে কায়দাকানুন, দুদিনে কলাকৌশল, তিনদিনে ফন্দি-ফিকির শেখা হল। এই ক'দিনে দুলালের চেহারাটায় বেশ জেল্লা দিয়েছে। মহাদেবের ওপর একটু যেন টান জন্মেছে। এতদিন তাকে নাম ধরে ডেকেছে। চোরকে কেউ কি দাদা-কাকা-মামা বলে? কিন্তু এখন আর নাম ধরে ডাকতে চাইলেও পারছে না। গুরু বলে কথা।

এবার হাতে-হাতে পরীক্ষার পালা। মহাদেবের ইচ্ছা প্রথম পরীক্ষাটা চেনাজানা জায়গায় হওয়া ভাল। অতএব বোম্বেওলার বাড়ি। দুলাল আঁতকে ওঠে। মামা বলে কথা। যতই তাড়িয়ে দিক আর অপমান করুক। মা'র নিজের ভাই তো!

মহাদেব সরু চোখে তাকায়। "তাহলি কাশী পালের বাড়ি হোক।"

দুলাল সঙ্গে সঙ্গে রাজি। কিন্তু মহাদেব জানায়, "চলো, তবে ধরা পড়লি জানিনে।"

দুলালের বুকের ভেতর ছ্যাঁত্ করে ওঠে। সত্যিই তো। বাড়ির চারধারে ছ-সাত ফুট উঁচু পাঁচিল। গেটে ঝোলে মস্ত তালা। "কেন, মিত্তিরবাড়ি চোখে দ্যাখো না?" দুলাল ধমক মারে। আর ধৈর্য থাকে না। মহাদেব খিক-খিক হাসে।

"মিত্তিরদের আছেটা কী? জমিজমা সব তোর বোম্বেওলা মামা কিনেছে। সম্বল বলতে ওই ধানমাড়াই কল। খাটুনি পোষাবে?"

একটু ভেবে দুলাল বলে, "তাহলি ভাসলিয়ার মল্লিকবাড়ি চলো। বউনি করব মামাবাড়ি দিয়ে? তা হয় না।"

দুলাল বেঁকে বসে। মহাদেব অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। দুলালকে বোঝায়, "আরে, যে-কোন কাজে বউনিটা ভালভাবে না করলি সবটাই মাটি। চেনাজানা জায়গা সুবিধে

কত। আন্‌কা জাগায় গিয়ে মরবি ?"

অগত্যা রাজি। সারাদিন সব বিদ্যে ঝালিয়ে নেওয়া হল। বিকেলের দিকে চাট্টি জল-দেওয়া ভাত খেয়ে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল দুজন। রাতে খাওয়া বন্ধ। খেয়েদেয়ে চুরি করতে গেলে দেবতা অসন্তুষ্ট হবেন।

ঘুম তো ঘুম। অসাড় ঘুম। যখন ঘুম ভাঙল তখন মোরগ ডাকছে। মহাদেব রাগ করতে পারে না। দোষটা তারই। আসলে এই ক'দিনে একটা আনাড়িকে নিয়ে ধকলটা নেহাত কম যায়নি। তাই ঘুমটা অমন গাঢ় হয়েছিল। পরদিন যাত্রা নাস্তি। বাধা পড়েছে। তার পরদিন দুলাল ঠিক রাজি হয় না। এইভাবে তিনদিন চলল। দুলাল খায় আর ঘুমোয়। এদিকে গ্রামে রামযাত্রার দল এসেছে। ফসল উঠলেই আসে। তখন মহাদেবের বাজার রমরমা। সে অনুনয় বিনয় করে। দুলালকে বোঝায়। তার চোখমুখ দেখে দুলালের কেমন মায়া হয়। বিপদে আশ্রয় দিয়েছে, খাওয়াচ্ছে। বলে, "ঠিক আছে। আজই যাব। তবে তিন বস্তার বেশি যদি লোভ করো, আমি সব ফাঁস করে দেব।"

মহাদেব হাসে। চাপা হাসি।

এদিন ঠিক রাত বারোটায় ঘুম ভাঙল। চোখেমুখে জলের ঝাপটা মেরে দুজনে রেডি। মহাদেব কোমরের গিঁট শক্ত করে বেঁধে কাছা গুঁজে নিল। একমুঠো ধুলো নিয়ে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে নিজের হাতে-বুকে মাখল, দুলালের হাতে-বুকে মাখাল। মহাদেবের চোখ জ্বলজ্বল করছে। দুলালের গোড়ালি থেকে দাঁত পর্যন্ত কাঁপছে। দু-ঢোক জল খেয়ে নিল। শীত-শীত করছে।

মহাদেবের হাতে একটা তিনফলা লোহার যন্ত্র। ওটা ওর জাদুদণ্ড। দুলালের হাতে একটা পেল্লাই বস্তা। মাঠে ধানের গোঁজ পায়ের পাতায় ফুটছে। দূরে প্রাইমারি ইস্কুলের মাঠে রামযাত্রার সংলাপ ছাড়িয়ে হারমোনিয়াম, তবলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। থেকে থেকে হৈ-হৈ। সোজাসুজি মাঠ পেরোলেই মামার বাগান। পুকুর। অরপর গোয়ালঘর। একবার উঁকি মেরে গোরুগুলো দেখতে গেল। মহাদেব ঘাড় ঘুরিয়ে দিল। মামা কাসছেন। খন-খন ঝন-ঝন শুকনো কাসি।

মহাদেব ফিসফিসিয়ে বলে, "কী রে, বোম্বেওলা জেগে আছে মনে হয়।"

দুলাল মাথাটা দু'দিকে নাড়ে। বলে, "ওটা একটা চোর তাড়ানো ব্যামো। আজ অনেকদিন পুষে রেখেছেন। ইচ্ছে করেই চিকিচ্ছে করান না।"

"বলিস্ কী ! আমি তো সেই ভয়েই আজ পর্যন্ত এ-বাড়িতে ঢুকিনি। তোর মামার তো বেয়াড়া বুদ্ধি।"

মামার প্রশংসা শুনে মনটা কেমন নরম হয়ে যায়। ··· বুদ্ধি না থাকলি এই বাড়ি-ঘরদোর, জমিজমা, পুকুর এত কিছু করতি পারে ! শুধু বুদ্ধি ! মনটাও দরাজ। কোত্থেকে লালবিহারী এসে জুটল। আর বিশ্বাস করে একটা কথা বলেই যত বিপদ।

"কী ভাবছিস ?"

"না। ভাবছি, লালবিহারী জেগে গেলি পাড়া মাথায় করবে চেঁচিয়ে।"

"যাতে না জাগে তার ব্যবস্থা করছি। দ্যাখ না।" মহাদেব সাহস জোগায়।

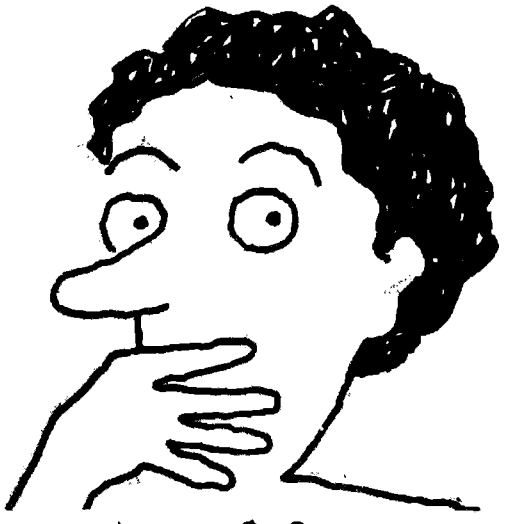

পোষা কুকুরটা দুলালকে ঠিক চিনতে পেরেছে। গা'র ধারে এসে শুঁকছে। মহাদেব এখন দুলালের পেছন-পেছন। কোণে যে-ঘরে দুলাল থাকত, সেখানে আলো জ্বলছে। মামার ঘুম ভাঙলে টর্চের আলো ফেলে দেখতেন। তিনি নির্ঘাত ঘুমোচ্ছেন। পা টিপে-টিপে দু'জন কোণের ঘরের বারান্দায় উঠল। নখ দিয়ে কী যেন আঁক কেটে মহাদেব বিড়বিড় করল। তারপর তিনফলা লোহার যন্ত্রটা দরজায় চাড় দিতেই খোলা হাট। ভেতর থেকে হাঁকপাড়ার শব্দ নেই।··· ব্যাপারটা কী ! লালবিহারী আজও গেছে রামযাত্রা শুনতে ! ··· দুলাল খেপে যায়।

"চুপ চুপ। তোর অতশত ভাবতি হবে না। আজ কেল্লা ফতে।" সারি সারি বস্তা। মহাদেব আনন্দে আত্মহারা। "নে, নে, হাত লাগা। মালপত্তর নিয়ে এত পথ যেতি হবে তো। এখন তো পুকুরপাড়ে ঝোপের ধারে নিয়ে থুই।"

দুলালের নজর পড়ল তার বিছানায়। দেখে মনে হল এখন তা লালবিহারীর দখলে। মেজাজ বিগড়ে গেল। এদিকে মহাদেবের হাভাতেপানা দেখে গা-পিত্তি জ্বলে যায়। ধান-চাল, সর্ষে, এখোগুড় যেন জীবনেও দেখেনি।

মহাদেব এটা নামাচ্ছে, ওটা সরাচ্ছে। দুলাল এক-পা দু-পা গোয়ালঘরে উপস্থিত। মশায় খাচ্ছে গোরুগুলোকে। একটু ধোঁয়া দিলে হত। লালবিহারীর ওপর রাগ চড়ে যায়। মামাকে ভালমানুষ পেয়ে ঠকানো ! মামার ঘরের দিকে একভাবে তাকিয়ে মনটা কেমন হু-হু করছে। এমন সময় ঝটপট তার ঘরের দিকে এগিয়ে এসে তড়িঘড়ি বাইরে থেকে দরজার শিকল দিল তুলে। তারপর চিৎকার, "মামা, মামা ! চোর, চোর !"

ঘুম ভেঙে মামা প্রথমে ভাবলেন স্বপ্ন। তারপর টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখলেন তার ভাগ্নে। তিনি ডাকেন, "দুলাল দুলু, বাবা দুলু।"

ঘরের ভেতর আটকে পড়া মহাদেবও চেঁচাচ্ছে "দুলাল, দুলু, বাবা দুলু।"

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। পড়শিরা ছুটে এসে দেখল, ও-ঘর থেকে মামার হাসিমুখ এবং এ-ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে, মহাদেবের কান্না। উঠোনের মাঝখানে দুলাল দাঁড়িয়ে আছে। মুখে হাসি।

ছবি : প্রবীর সেন

বাঁকুড়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

পশ্চিমবাংলার যে দু' তিনটি জেলাকে আমরা অনগ্রসর বলে জানি, বাঁকুড়া তার মধ্যে একটি। কিন্তু বাঁকুড়া শহরে অবস্থিত বাঁকুড়া জিলা স্কুলের মতো একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখার পর, সে-ধারণা পালটে গেল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে হিসেব করে দেখালেন, স্কুলটির বয়স এখন প্রায় দেড়শো বছর। বাঁকুড়া জিলা স্কুলের যখন প্রতিষ্ঠা হয়, তখনও আমাদের দেশে সিপাহি বিদ্রোহ হয়নি। তৈরি হয়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অবিভক্ত বাংলাদেশে স্কুল-কলেজের সংখ্যাও ছিল তখন নিতান্ত নগণ্য। সেই সময় গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে লালমাটির দেশ বাঁকুড়ায় তৈরি হয় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—বাঁকুড়া জিলা স্কুল। শুধু বয়েসেই নয়, লেখাপড়া, পরীক্ষার ফলাফল, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সব দিক থেকেই এই স্কুল এখন জেলাবাসীর গর্ব।

বাঁকুড়ার তৎকালীন জেলাজজ ফ্রানসিস গোল্ডবেরির উৎসাহে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সংগৃহীত অর্থে বাঁকুড়া জিলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৪০ সালে। প্রতিষ্ঠার সময় নাম ছিল বাঁকুড়া ফ্রি স্কুল। প্রথম অবস্থায় স্কুলে ছাত্রদের মাইনে লাগত না। বইপত্রও দেওয়া হত বিনা পয়সায়। প্রথম প্রধানশিক্ষক ছিলেন যাদবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪০-'৪৬)। তিনি ছাড়াও আর-একজন শিক্ষক ছিলেন। এই দু'জন শিক্ষক ছাত্রদের যে-সব বিষয় পড়াতেন, তার তালিকাটি এইরকম : মারের স্পেলিং বুকস্, গ্রিস রোম ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ড ও বাংলার ইতিহাস, স্টুয়ার্টের জিওগ্রাফি, লেনির গ্রামার, চ্যাসনিয়ারের অ্যারিথমেটিক, ব্রিজের অ্যালজেবরা, লেসনস্ অন অবজেক্টস্, ফিলজফিক্যাল ওয়ার্কস ইত্যাদি।

এই স্কুলের কৃতী ছাত্রের তালিকাটি

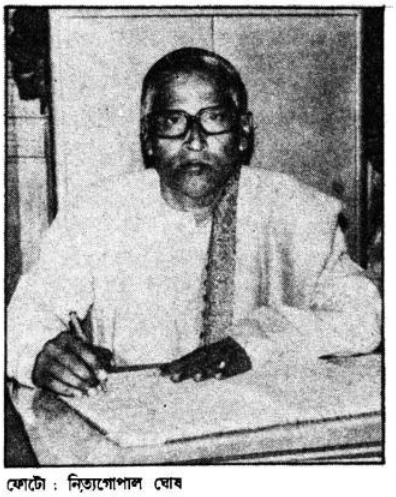

ফোটো : নিত্যগোপাল ঘোষ

বেশ দীর্ঘ। অনেকেই দেশের গৌরব বাড়িয়েছেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর বসন্তকুমার নিয়োগী, রায়সাহেব রামনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাশ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত—এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম।

বাঁকুড়া জিলা স্কুলে পরীক্ষার ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। ১৯৮৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৩৯ জন ছাত্র। প্রথম বিভাগে পাশ করেছে ২৩ জন। দ্বিতীয় বিভাগে ১২ জন। তৃতীয় বিভাগে ৪ জন। কেউ ফেল করেনি। স্টার পেয়েছে ৯ জন। ১৯৮৩ ও ১৯৮২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৮ (৪৪+৪৪) জন। প্রথম বিভাগে পাশ করেছিল ৪৮ (২৪+২৪) জন ছাত্র। বাদবাকি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে। একজনও ফেল করেনি। স্টার পেয়েছিল ৪ (১+৩) জন। ১৯৮৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৪৪ জন ছাত্র। প্রথম বিভাগে পাশ করেছিল ১৬ জন। দ্বিতীয় বিভাগে ২৪, তৃতীয় বিভাগে ৩। স্টার পেয়েছিল ২ জন। ১৯৮৩ সালে এই স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ছিল এইরকম : মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৪। প্রথম বিভাগ ২৫। দ্বিতীয় বিভাগ ১৮। তৃতীয় বিভাগ ১। স্টার পেয়েছিল ৪ জন। জাতীয় মেধাবৃত্তি প্রতি বছরই থাকে। এই স্কুলের ছাত্ররা বহুবার স্ট্যাণ্ড করেছে। এই স্কুলের ছাত্র শ্রীদেবদাস কর্মকার ১৯৬৯ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছিলেন। শ্রীসোমশুভ্র সিকদার ১৯৭৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান পেয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালে শ্রীঅনমিত্র মাকুর দ্বাদশ স্থান, ১৯৭৯ সালে শ্রীবিশ্বরূপ বসু ষোড়শ স্থান, ১৯৮১ সালে শ্রীঅসীমকুমার বসু সপ্তদশ স্থান অর্জন করেছিলেন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসন্তোষকুমার দাঁ ইতিহাসের এম. এ.। ১৯৭৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে এই স্কুলের প্রধানশিক্ষক। এর আগে নিউ আলিপুর মালটিপারপাস হাইস্কুল, বারাকপুর গভর্নমেণ্ট হাইস্কুল, দুর্গাপুর প্রোজেক্ট বয়েজ হাইস্কুল, বারাসত গভর্নমেণ্ট হাইস্কুল ও নারাজোল মহেন্দ্র একাডেমিতে শ্রীদাঁ শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ৩৩ বছরের। **কীভাবে তৈরি হলে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যাবে,** এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানশিক্ষক জানালেন, "পরীক্ষায় ভাল ফল স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রের সমবেত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। স্কুলে যদি পূর্ণ শৃঙ্খলা থাকে, মাস্টারমশাইরা যদি প্রতিটি বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী সময়মতো শেষ করতে পারেন, তা হলে পরীক্ষার ফল আশাব্যঞ্জক হবেই। পাঠ্যসূচী পুরোপুরি পড়ানো না হলে পরীক্ষায় ভাল ফল আশা করা অনুচিত। স্কুলে ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা ছাড়াও সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। এই ধরনের পরীক্ষা ছাত্রদের উদ্যমী ও পরিশ্রমী করে তোলে, মনোবল বাড়িয়ে দেয় এবং বলাবাহুল্য, পরীক্ষায় ভাল ফল করার ব্যাপারে সাহায্য করে। ছাত্রদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি, ঠিকমতো হোমটাস্ক করা, দ্রুত লেখার অভ্যাস এগুলো খুবই দরকার। লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে, একঘেয়েমি কাটাবার জন্য,

স্কুলে উপযুক্ত শরীরচর্চা, নানা ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে ছাত্রদের মন সতেজ ও প্রফুল্ল থাকবে, লেখাপড়ার উৎসাহ বাড়বে। অনেকে নোটবই পড়তে বারণ করেন। আমি মনে করি, নোটবই পড়ারও দরকার আছে। পাঠ্যবিষয়ে এমন অনেক জটিল প্রসঙ্গ আছে, যার মর্মোদ্ধার করতে মাস্টারমশাইদের হিমশিম খেতে হয়। সেজন্য ভাল লেখকের নির্ভরযোগ্য নোটবই পড়া যেতে পারে। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করতে হলে প্রথম থেকেই মনে উচ্চাশা থাকা দরকার। সেইসঙ্গে পড়াশোনাও করতে হবে বিস্তর। পরিশ্রম এবং সাধনাই সাফল্যের প্রকৃত চাবিকাঠি এনে দিতে পারে।"

কীভাবে ইংরেজি ও বাংলা পড়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীদাঁ জানালেন, "বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত—যে ভাষাই হোক না কেন, ভাষা-শিক্ষার মূল কথা হল সেই ভাষার ব্যাকরণ খুব ভালভাবে জানা। যারা বাংলা ব্যাকরণে ভাল নম্বর তুলতে চায়, তাদের সংস্কৃত ব্যাকরণও জানতে হবে নিখুঁতভাবে। বাংলা এবং সংস্কৃত, এই দুই ভাষার ব্যাকরণে যাদের দখল আছে, তাদের জন্য ভাল নম্বরও বাঁধা। আবার ইংরেজি গ্রামারের প্রাথমিক অংশগুলি বাংলা ব্যাকরণের জ্ঞানের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। বাংলা ও ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য শুধু পাঠ্যবই পড়লেই হবে না, নামী লেখকদের নানা ধরনের বই পড়তে হবে। সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকাও পড়া দরকার। এছাড়া, ভাল হাতের লেখা, নির্ভুল বানান, যথাযথ উত্তর লেখা, পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য এসব তো দরকার হয়-ই।"

অঙ্ক ও বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, "অঙ্ক ও বিজ্ঞানে ভাল করার জন্য বুদ্ধি ও অনুশীলন, দুটোই দরকার। বিদ্যালয়ে যদি বইয়ের প্রতিটি অঙ্ক কষে দেওয়া হয় এবং জ্যামিতির অনুশীলনীগুলিও করে দেওয়া হয়, তা হলে ছাত্রদের অঙ্কভীতি অনেকটা কমে যাবে। বাড়িতে নিয়ম করে অঙ্ক কষতে হবে। জ্যামিতি মুখস্থ করে কোনও লাভ হয় না। কাজেই মুখস্থ না-করে জ্যামিতি বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়া ছাড়া গতি নেই। যে যত ভালভাবে পড়বে, সে তত লাভবান হবে। ছবি আঁকার অভ্যাসও করতে হবে।"

ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে প্রধানশিক্ষক বললেন, "ইতিহাস এবং ভূগোল বিষয় দুটি পরস্পরের পরিপূরক। দুটি বিষয়েই পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক পুস্তক পড়া ছাড়াও ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ করতে পারলে ভাল হয়। এ ছাড়া নকশা, মানচিত্র অঙ্কন ইত্যাদি বেশ ফলপ্রদ।"

কর্মশিক্ষা বিষয়টি সম্পর্কে শ্রীসন্তোষকুমার দাঁ জানালেন, "কর্মশিক্ষা বিষয়টি সম্পর্কে আমি হতাশ। যে বিষয় ছাত্রদের পরিশ্রমী করে তোলে না, যা তাদের জীবিকার্জনে সাহায্য করে না, যে বিষয় ছাত্রদের বিন্দুমাত্র উৎসাহিত করে না, সেই বিষয় সম্পর্কে আমি কী বলব ?"

স্কুলের কাজ নিয়ে প্রধানশিক্ষক এত ব্যস্ত থাকেন যে, পত্রপত্রিকা পড়ার তেমন সময় পান না। তবু মাঝেমধ্যে আনন্দমেলা তিনি পড়েন। এই পত্রিকার বিষয়-বৈচিত্র্য তাঁর ভাল লাগে। "আনন্দমেলা প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর পড়া উচিত।"

শ্যামলকান্তি দাশ

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

'আনন্দমেলা' থেকে এসেছি শুনে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীপঙ্কর বলল, "আনন্দমেলায় ভাল-ভাল ছেলেমেয়েদের কথা বেরোয়, কী ভাল নম্বর পায় তারা, আমি তো তাদের কাছে কিচ্ছু না।" নম্র, বিনয়ী দীপঙ্করের এই সরল সুন্দর কথাবার্তায় খুশি না হয়ে পারলাম না।

দীপঙ্কর আগে পড়ত পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে। এখানে ক্লাস এইটে ভর্তি হয়েছে। গত বছর থেকে ফার্স্ট হচ্ছে। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ৯০০র মধ্যে দীপঙ্কর পেয়েছে ৭৬৫।

দীপঙ্করের বাবা শ্রীসুনীলবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মা শ্রীমতী মিনু বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপঙ্কর বাবার কাছে ইংরেজি পড়ে। একজন প্রাইভেট

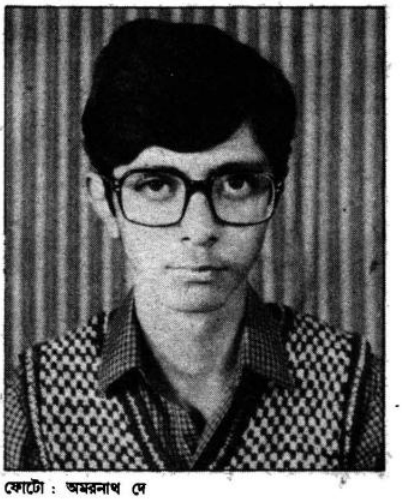

ফোটো : অমরনাথ দে

টিউটর আছেন, তিনি দীপঙ্করকে দেখিয়ে দেন অঙ্ক এবং বিজ্ঞান। দীপঙ্কর দিনে ৬/৭ ঘণ্টা পড়ে, ছুটির দিনে আর-একটু বেশি।

দীপঙ্কর ইংরেজিতে পি মাহাতো ও রেন-মার্টিনের বই পড়ে। বাংলায় পড়ে বামনদেব চক্রবর্তী ও পালচৌধুরীর বই। ইতিহাস : কিরণ চৌধুরী, প্রভাতাংশু মাইতি। ভূগোল : বসু-ভট্টাচার্য, পীযূষ সেন- নীরেন সেন। অঙ্ক : মাইতি-মাইতি, কেশবচন্দ্র নাগ। ভৌতবিজ্ঞান : সমর গুহ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত। জীবনবিজ্ঞান : বসাক-সরকার, সান্যাল-চট্টোপাধ্যায়। অতিরিক্ত গণিত : জানা-মিত্র, মাইতি-মাইতি।

দীপঙ্কর পাঠ্যবই ছাড়া গল্পের বই পড়তে খুব ভালবাসে। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা, আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "সন্তু-কাকাবাবুর গল্প বারবার পড়েও আশ মেটে না।" ছবি আঁকাও তার প্রিয় শখ। আনন্দমেলার পাতায় বিমল দাসের ছবি তার "খুব ভাল লাগে।" প্রিয় খেলা ক্রিকেট। প্রিয় খেলোয়াড় কপিলদেব। বড় হয়ে দীপঙ্কর ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

'আনন্দমেলা' দীপঙ্করের প্রিয় পত্রিকা। 'সদাশিব' 'টিনটিন' 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' পড়তে খুব ভাল লাগে।

স্নেহ

নিমেষে গুলে যায় এমন স্কীমড্ মিল্ক পাউডার

স্নেহ স্কীমড্ মিল্ক পাউডার। শুধু জলে দিলেই হ'ল...নিমেষে গুলে যায়! গরম জল দরকার নেই। দলা পাকায় না। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। পুষ্টিতে ভরা কম চর্বিযুক্ত এই দুধ সরাসরি ব্যবহার করুন—চা বা কফি, দই বা মিষ্ঠান্ন বানানোর জন্যে।

স্নেহ স্কীমড্ মিল্ক পাউডার। পুষ্টিগুণে ভরা এই সুবিধাজনক প্যাক হাতের কাছে রাখুন।

মধ্য প্রদেশ দুগ্ধ মহাসংঘের উৎকৃষ্ট ডেয়ারী উৎপাদন

স্নেহ-প্রকৃতির সস্নেহ উপহার!

OBM/4477-BEN

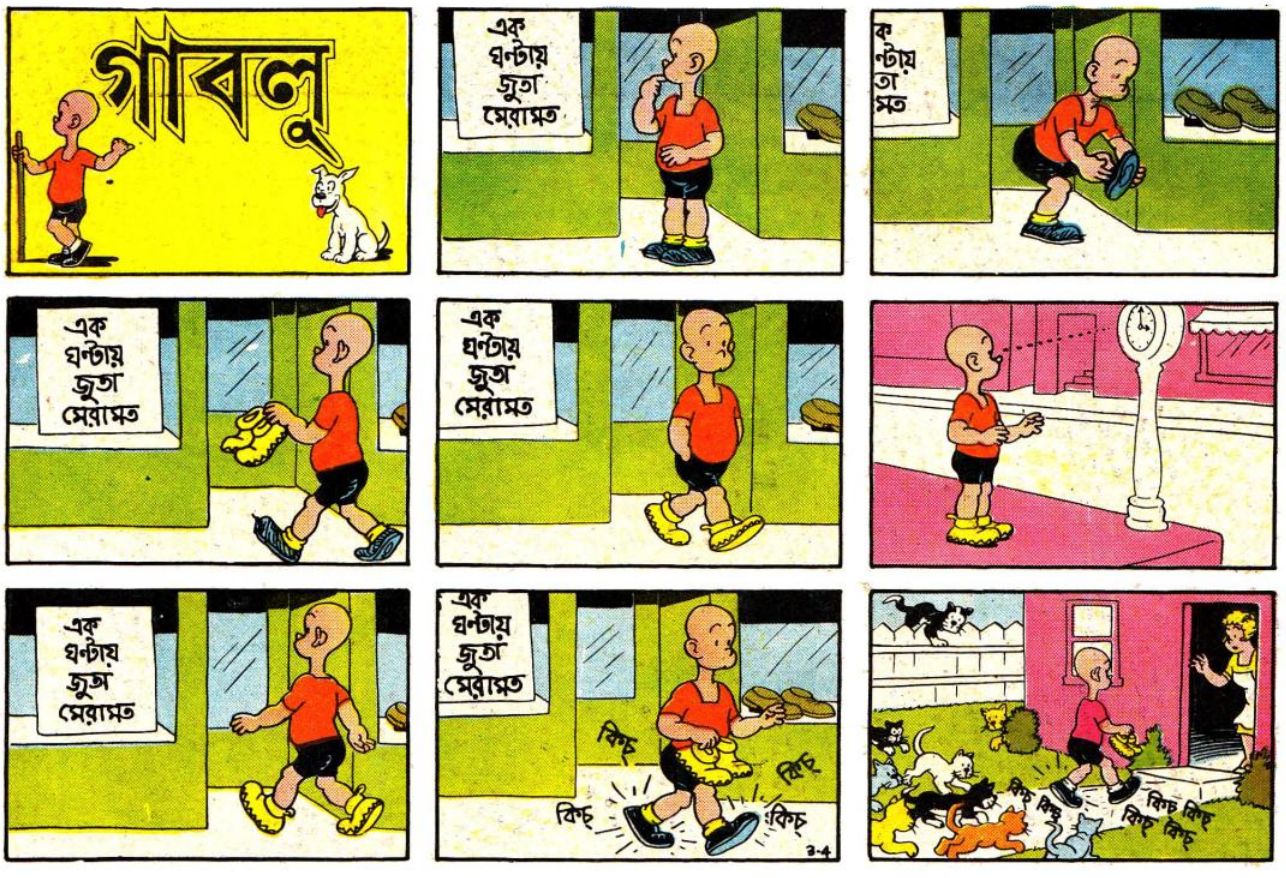

গাবলু
এক ঘণ্টায় জুতা মেরামত
ক ণ্টায় তা মত
এক ঘণ্টায় জুতা মেরামত
এক ঘণ্টায় জুতা মেরামত
এক ঘণ্টায় জুতা মেরামত
এক ঘণ্টায় জুতা মেরামত
কিচ্ কিচ্ কিচ্ কিচ্
3-4
কিচ্ কিচ্ কিচ্ কিচ্ কিচ্ কিচ্

গাবলু
বাঘ সিংহ শিকার
12-25

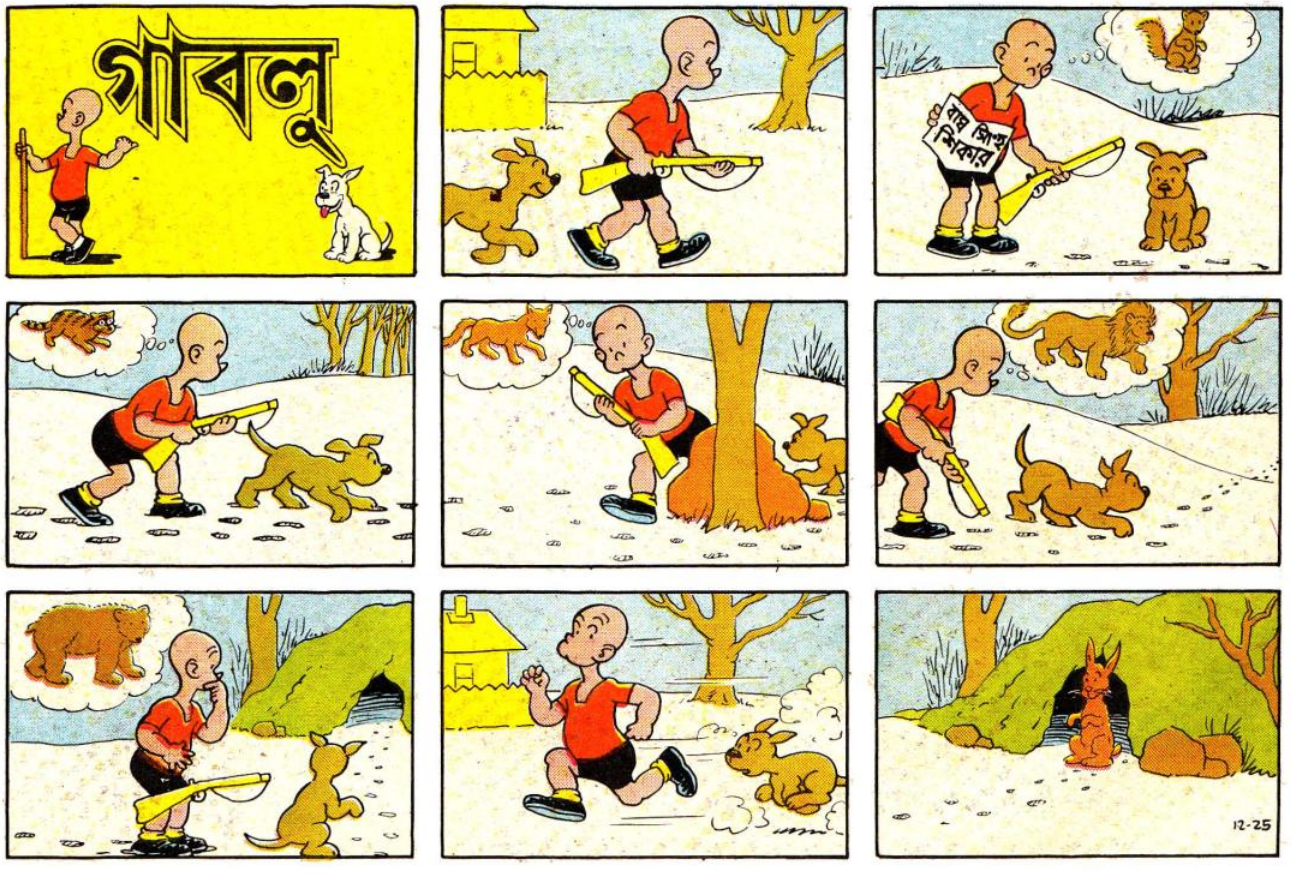

প্রিয় লেখক, প্রিয় বই

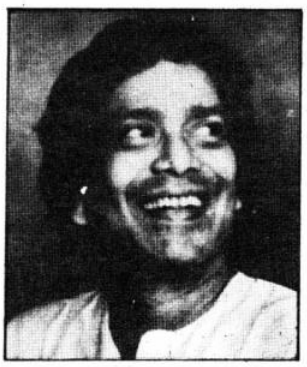

ছোট্ট গোগোলের নানান অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী এখন শুধু ছোটদেরই প্রিয় নয়, বড়রাও এ-সব বই নিয়ে কাড়াকাড়ি করেন। না করে উপায়ই বা কী। ক্ষুদে গোয়েন্দা গোগোল যে-সব রহস্যে জড়িয়ে পড়ে, আর যেভাবে সব জাল কেটে বারবার বেরিয়ে আসে, তার কাহিনীগুলো সত্যিই দুর্ধর্ষ। বয়স নির্বিশেষে এ-সব ঘটনার উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ সবাইকে কৌতূহলী করে রাখে। তা সেই কিশোর-চুরির রহস্যভেদের কাহিনী 'বন্ধ ঘরের আওয়াজ'-ই হোক, কিংবা হোক নাগাল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়ে কুকুরছানা উধাও হবার গল্প, অথবা হোক গাড়ির নম্বর টুকে রেখে ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ধরে ফেলার আশ্চর্য উপাখ্যান। অবশ্য গোগোলের এইসব গোয়েন্দাগিরির গল্পের বাইরেও আরেকটি দুর্দান্ত ছোটদের উপন্যাস লিখেছেন সমরেশ বসু। তার নাম 'মোক্তারদাদুর কেতুবধ'। কিশোর সুরথ ও তার মোক্তারদাদুকে নিয়ে গ্রামবাংলার পটভূমিকায় লেখা এ-উপন্যাসটিও অভিনব স্বাদের।

সমরেশ বসুর কিশোর-গ্রন্থ-সম্ভার :

মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৮·০০, বন্ধ ঘরের আওয়াজ ১২·০০, গোগোল চিক্কুস নাগাল্যাণ্ডে ১২·০০, সেই গাড়ির খোঁজে ১০·০০

গিরিধারী কুণ্ডু এবং একটি মনের মতো বই

গিরিধারী কুণ্ডু চমৎকার একটি বই লিখেছেন তোমাদের জন্য। নাম 'টংসা চু'। ভুটানের নদী টুংসা, আদর করে সবাই ডাকে টংসা। ভয়ংকর সবুজ পাহাড়ের গভীরে এই নদী আপন খেয়ালে বয়ে চলেছে। কখনও সবার কাছে ধরা দেয়, কথা বলে, আবার শরীর লুকোয় মাটির জামার ভেতর! সেই নদীকে ঘিরে ছবির মতো দেশ ভুটানকে নিয়ে দারুণ দারুণ সব গল্প এই বইতে। এই বইটি একটি পুরস্কারও পেয়েছে।

গিরিধারী কুণ্ডুর বই
টংসা চু ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

বেংসরকর (রানে ফিরেছেন)

সিরিজ জিতল ইংল্যাণ্ড

রাজা গুপ্ত

কানপুরে খেলা শেষ হবার পরে দু' দেশের ব্যাটসম্যানরাই জানতে চেয়েছিলেন পিচটা তৈরি করেছে কারা ? কারণ এমন নিষ্প্রাণ পিচে ব্যাট হাতে রাজত্ব করার সুযোগ সারা পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। পিচের কারিগরদের খোঁজ নিয়েছিলেন দু'দেশের বোলাররাও। পিচ তো নয়, যেন কুম্ভকর্ণ। সুইংয়ের ধাক্কা, বাম্পারের গুঁতো, স্পিনের কাতুকুতু কোনও কিছুতেই ঘুমন্ত পিচের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। এমন পিচ পেয়ে ব্যাটসম্যানরা যতটা খুশি, বোলাররা ঠিক ততটাই খাপ্পা।

দু'দিনেরও বেশি সময় নিয়ে ভারত ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৫৫৩ রানের রেকর্ড তৈরি করল আজহার, বেংসরকরের সেঞ্চুরি, শ্রীকান্তর ৮৪ এবং শাস্ত্রীর ৫৯ রানের সহায়তায়। আগের দুটি টেস্টের মতো এই টেস্টেও আজহারের শতপূর্তি তাঁকে বিশ্ব-ক্রিকেটে এক অসাধারণ কীর্তির অধিকারী করল। অভিষেক টেস্ট থেকে শুরু করে উপর্যুপরি তিনটি টেস্টে তিনটি শতরান আর কোনও ক্রিকেটারের নেই। এই সিরিজে বাইশ বছরের আজহার অবহেলায় নাড়াচাড়া করলেন পেশাদার ইংরেজ পেস এবং স্পিন বোলারদের।

ভারত চেয়েছিল ইংল্যাণ্ডকে ফলো-অন করাতে। কিন্তু ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের ফলো-অনের আশঙ্কায় বিন্দুমাত্র আতঙ্কিত করতে পারেননি ভারতীয় বোলাররা। বিপক্ষের ইনিংস চেরার মতো ধার কপিলের বলে আর নেই। শুধু এই ম্যাচেই নয়, এই সিরিজে কপিলের বোলিং ব্যাটারিটি নিঃসন্দেহে 'ডাউন' ছিল। 'বিস্ময়-বালক' শিবরামকৃষ্ণনও ম্লান ছিল এই টেস্টে। শুধু প্রথম টেস্ট খেলতে-নামা অফ্ স্পিনার গোপাল শর্মা চতুর্থ দিনে চায়ের এক ঘন্টা আগে হঠাৎই চাঞ্চল্য তোলেন গ্যালারিতে মাত্র উনত্রিশটি বলে গ্যাটিং, কাউড্রে আর ডাউনটনকে সরিয়ে দিয়ে। কিন্তু ওইটুকুই। পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেন ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার স্বয়ং। গোটা সিরিজে গাওয়ারের রান-উপোসি ব্যাটটি হঠাৎই ফিরে এল রানে, সেইসঙ্গে ত্রাতার ভূমিকায়। ইংল্যাণ্ড ফলো-অন বাঁচাল।

শেষ দিনে ঝড়ের গতিতে এক উইকেটে ৯৭ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে গাওস্কর সবাইকে বোঝাতে চেয়েছিলেন এই টেস্ট জিততে এবং সিরিজে সমতা আনতে তিনি কত ব্যগ্র। কিন্তু গাওয়ার এবং রবিনসনের বিপক্ষে বোলিং শুরু করার অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে বুঝে যায় যে, এই টেস্টে ইংল্যাণ্ড জেতার জন্যে খেলছে না। সিরিজে এগিয়ে থাকার সুযোগ হাতছাড়া করার মতো ঝুঁকি যে ইংরেজরা নেবেন না, এটা সকলেই জানতেন।

ম্যাচটি ড্র রেখে ইংল্যাণ্ড ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে 'ডিমেলো ট্রফি' লাভ করল। ভারত প্রথম টেস্টে জিতেও সিরিজে হেরে গেল, এই দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে একথাও মেনে নিতে হবে যে, ভারত হেরেছে যোগ্য দলের কাছে এবং সর্ববিভাগে। এই সিরিজ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করল, কয়েকজন নামী ভারতীয় ক্রিকেটারের বিকল্প খোঁজার সময় এসে পড়েছে।

গাওয়ার (সফল নেতৃত্ব)

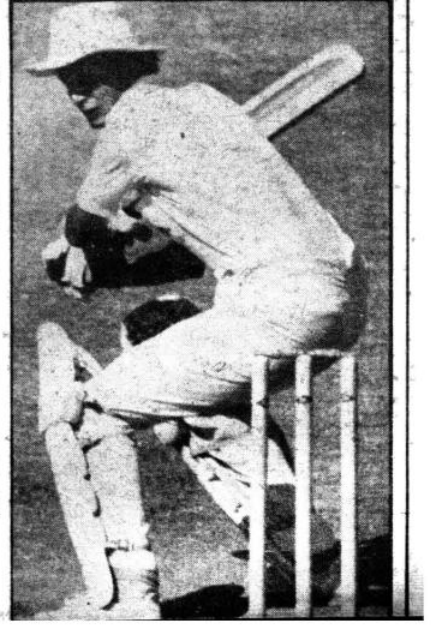

তোমাদের সংগ্রহের অ্যালবাম সুসম্পূর্ণ করতে এই ডাক টিকিটগুলির কোন্‌টি চাই ?

আজই তোমাদের দরকারী টিকিটগুলির অর্ডার দিয়ে দাও— আর কেমন তাড়াতাড়ি নিজের নিজের অ্যালবাম বেড়ে ওঠে, দেখ !

চিনার এমন সব অবিশ্বাস্য সুন্দর ডাক টিকিট পাঠাতে পারে, যা দেখে তোমাদের মতো ডাক টিকিটের খাঁটি সমঝদাররাও চমকে যাবে। পুরনো ও নতুন, মোহর দেওয়া ও ব্যবহৃত, কত রকম ডিজাইন, রং এবং আকারের সে সব ডাক টিকিট—

তোমাদের মনে হবে, আগে কখনো দেখোনি ! বিষয় হাজারো রকমের, মহাকাশ ও খেলাধূলা থেকে ফুল ও সোভিয়েত দেশের ইতিহাস পর্যন্ত।

তোমাদের জন্য "হাতে পেলে টাকা দেবে" সুযোগ

জোগাড় করা সত্যিই সোজা ! নিচের কুপনটি ভর্তি করে চিনার-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। আগাম টাকাও পাঠাতে পারো, তাহলে ডাক ব্যয় লাগবে না। অথবা ভি· পি· পি· -তে ডাক টিকিট পাঠাতে লেখো, সেক্ষেত্রে ডাক ব্যয় তোমাদের দিতে হবে। ভি· পি· পি· -তে অর্ডারের বেলায়, অবশ্যই তোমাদের বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে নিও।

কে এই চিনার ?

— ভারতে ডাকটিকিটের অগ্রণী আমদানী ও রপ্তানিকারক।

— ইউ এস এস আর থেকে আসা ডাকটিকিটের একমাত্র ভারতীয় ডিস্ট্রিবিউটর।

— তোমাদের সংগ্রহ গড়ে তুলতে সাহায্যকারী এক সংস্থা।

ন্যূনতম অর্ডার ২৫ টাকা।
১০% বিক্রয় কর আলাদা।

চিনার —
অসংখ্য সংগ্রাহকের জন্য
অজস্র ডাকটিকিট
আমদানি করে— প্রতিদিন।

চিনার এক্সপোর্টস প্রাঃ লিঃ
রেজিঃ অফিস :
১০১এ, সূর্য কিরণ
কস্তুরবা গাদ্ধী মার্গ,
নয়া দিল্লি-১১০ ০০১।

তাড়াতাড়ি ! আজই তোমাদের কুপন ডাকে পাঠিয়ে দাও।

যে বিষয়ের ও যতটির প্যাকেট চাও, তাতে গোল দাগ দাও

বিষয়	১০	২৫	৫০	১০০ ডাক টিকিট
☐ মহাকাশ	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
☐ খেলাধূলা	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
☐ পরিবহণ	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
☐ শিল্প	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
☐ ফুল	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
☐ জীবজন্তু	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
☐ জলযান/ সমুদ্র-জীবন	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩০·০০*
☐ চিত্রকলা	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	—
☐ লেনিন	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	২৫·০০**
☐ মস্কো	—	—	—	৩০·০০
☐ সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্য	—	—	৩০·০০***	—
☐ শান্তি ও মৈত্রী	—	৮·০০	—	২৫·০০
☐ অক্টোবর বিপ্লব	৩·৭৫	—	—	২৫·০০
☐ নানারকম	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	২৫·০০

*৯০টি স্ট্যাম্প ** ৮৫টি স্ট্যাম্প ***৫৩টি স্ট্যাম্প

নাম .....
বয়স .....স্কুল .....
বাড়ির ঠিকানা .....

FN/XII-546

ডাকটিকিট—এর সংগ্রহ তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে ওঠে।

বিনামূল্যে
অতিরিক্ত
১০টি স্ট্যাম্প,
প্রত্যেক অর্ডারে

আজহার, এই সিরিজের আবিষ্কার

অশোক রায়

বেশ কিছুদিন ধরে আমরা সবাই পাথরটাকে খুঁজছিলাম। যা ঠেকালেই লোহা সোনা হয়ে যায়। ভঙ্গুর মিড্‌ল-অর্ডারে শক্তি এনে দিতে সারা ভারত যে ব্যাটিং-রত্নটির জন্যে অপেক্ষায় ছিল এতকাল, উনিশশো চুরাশির একত্রিশে ডিসেম্বর ইডেনে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হল সেই মহামূল্যবান বস্তুটি। পাওয়া হল পরশপাথর, ভারতীয় ক্রিকেটে মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে।

ছিপ্‌ছিপে চেহারা। মাথার চুল আর দাঁতের সারি কিছুটা এলোমেলো। দু'চোখে লাজুক-নম্রতা নিয়ে ইডেনে এসেছিলেন 'আজরু'। ঠিক আগের রঞ্জি ট্রফি ম্যাচে অন্ধ্রের বিপক্ষে তাঁর দু'ইনিংসে ঝক্‌ঝকে সেঞ্চুরি নির্বাচকদের নজর কেড়েছিল আগেই। টেস্ট শুরুর আগের দিন নেটে ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে তাঁর নির্ভীক ফুটওয়ার্ক নির্বাচকদের আস্থায় গভীরতা এনে দিল। ভারতের ১৬৯-তম টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে ইডেনে পা রাখলেন আজহারউদ্দিন। তারপরের ঘটনা ইতিহাস।

গায়কোয়াড়, গাওস্কর, বেংসরকর আউট অল্প রানে। গ্যালারি স্তব্ধ। এলিসনের সুইং, এডমণ্ডসের স্পিনের জাদুতে ভারত তখন সম্মোহিত। উইকেটে এলেন আজহার ধীর, শান্তভাবে। মেঘলা আবহাওয়ায় এলিসনের ভয়ঙ্করভাবে বাঁক-নেওয়া বলটি খেললেন মাঝ-ব্যাটে। উৎকণ্ঠিত আশি হাজার দর্শক সেই একটি স্ট্রোকেই চিনে নিল তাঁকে, বুঝে গেল, 'সে এসে গেছে।' ছোট ছোট ফ্লিক, প্লেসিং, ট্যাপিং একটু-একটু করে এগিয়ে দিচ্ছিল আজহারউদ্দিনকে। হাত জমে ওঠার পরে ক্রমশ বেরিয়ে এল অন্ এবং অফ্ সাইডে বেশ কিছু জোরালো ড্রাইভ, সেইসঙ্গে স্কোয়ার কাট। দেখতে দেখতে আজহার পৌঁছে গেলেন নব্বুইয়ের ঘরে। নব্বুই থেকে একশোর পথটা বড় পিছল। কত ক্রিকেটারের কত স্বপ্ন কতবার নিভে গেছে মাত্র দশটা রানের জন্যে। তাছাড়া দীপক শোধন বাদে ইডেনে আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি আর কোনও ভারতীয় করেননি। সতর্ক আজহার ঠাণ্ডা মাথায় অতিক্রম করলেন নব্বুইয়ের গাঁট, পৌঁছলেন শতরানের লক্ষ্যে। উল্লসিত ইডেন মুহূর্তে বাইশ বছরের তরুণকে আপন করে নিল। অবাক হবার মতোই ঘটনা, যে দু'জন নির্বাচক আজহারকে ইডেনে খেলালেন, সেই হনুমন্ত সিং এবং কৃপাল সিংও ভারতের হয়ে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরি করেছিলেন! সেঞ্চুরির পরে ইডেনে সাংবাদিকদের সামনে আজহার সলজ্জ কণ্ঠে জানালেন, "অন্য তিন ভাই কিংবা দুই বোনের কেউই ক্রিকেটে তেমন উৎসাহী নয়। শুধু বাবা আজিজুদ্দিন এই খবরে খুব খুশি হবেন।"

কলকাতা জয়ের পরে মাদ্রাজে গেলেন আজহার পরের টেস্ট খেলতে। এবং সেখানেও ইংরেজদের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাট রানের খিদে মেটাল সেঞ্চুরি দিয়ে। পরপর দুটি শতরানে মুগ্ধ, বিস্মিত ক্রিকেটপ্রেমীরা আশ্বস্ত হতে শুরু করেছিল, ঠিক তখনই এল তৃতীয় শতরান। অর্থাৎ বিশ্ব-রেকর্ড!

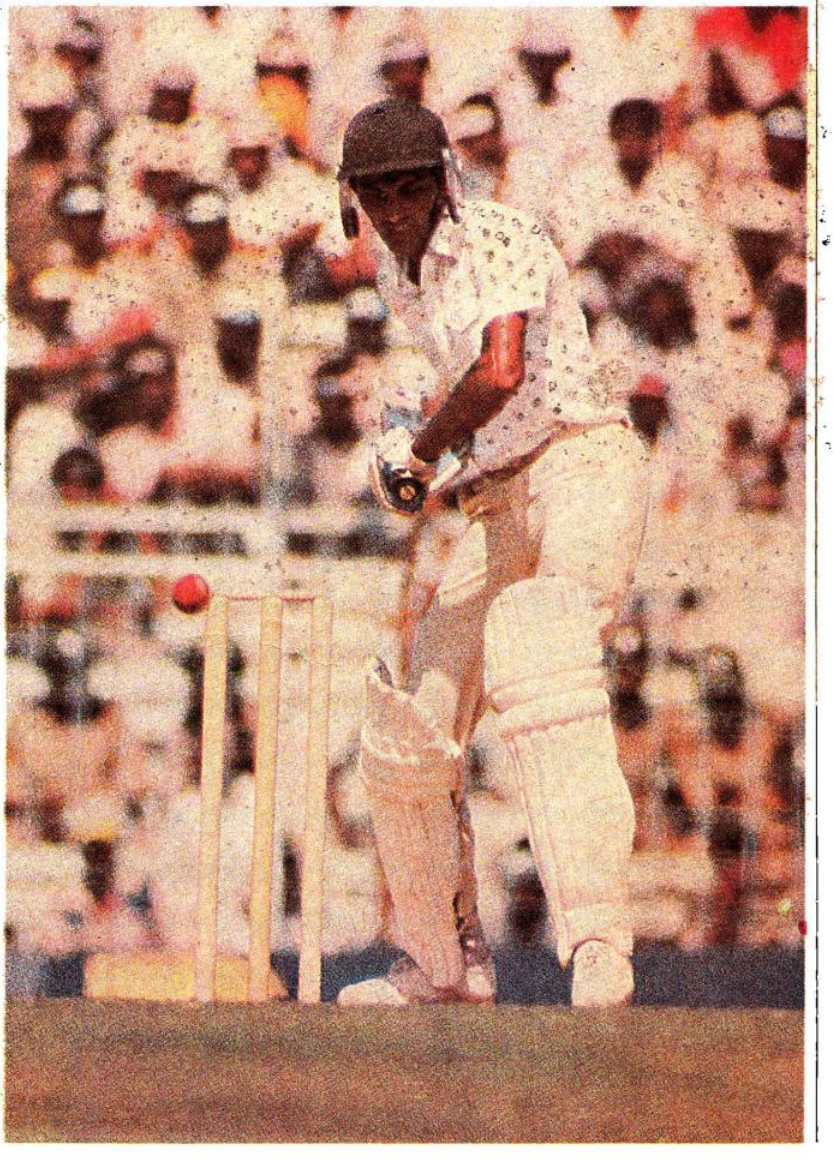

বিতর্কিত গোলে হকিতেও হার

নৃপতি চৌধুরী

একশো মিনিটব্যাপী সম্মানের লড়াইয়ে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে জিতল ৩—২ গোলে। আর সেই সুবাদে দ্বিতীয়বার ঘরে তুলল এশিয়া কাপ।

দ্বিতীয় এশিয়া কাপ হকিতে ভারত বা পাকিস্তানের সমগোত্রীয় টিম ছিল না। সুতরাং প্রথম থেকেই এই ধারণা সবার মনেই গড়ে উঠেছিল যে, গতবারের মতো এবারও শীর্ষ-সম্মান দখলের প্রশ্নটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

বরাবরের মতো ভারত শুরু করেছিল সাড়া জাগিয়েই। 'বি' গ্রুপের প্রথম খেলায় ভারত শ্রীলংকাকে ছ' গোলে হারায়। দ্বিতীয় খেলায় অনায়াসে অর্জিত ৮—১ গোলে জয়ের ফলাফলই বলে দিচ্ছে, ভরতকে কোনও রকম বাধা দেবার ক্ষমতা দক্ষিণ কোরিয়ার ছিল না। তৃতীয় ম্যাচে সিঙ্গাপুরকে পরিষ্কার ফাইভ-নিলে এবং গ্রুপের শেষ খেলায় মালেশিয়ার বিরুদ্ধে তিন গোলে জিতে ভারত সেমিফাইনালে পৌঁছয়। অসম প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে চারটি ম্যাচে বাইশটি গোল করে ভারতীয় ফরোয়ার্ডরা 'গোলক্ষুধা' মিটিয়ে নেন প্রাণ ভরে। এমনকী, সেমিফাইনালে জাপানি কলকব্জাগুলোও নড়বড়ে করে দেয় ভারত, স্টিকের বিস্ময়কর কারুকাজে। ভারত জেতে ৯—১ গোলে। বলতে দ্বিধা নেই, ঢাকার দর্শকদের প্রাণবন্ত হকিতে মুগ্ধ করে রাখে ভারত। বিশেষ করে মহম্মদ শাহিদ এবং মহম্মদ নঈমের বোঝাপড়া, স্টিক্ওয়ার্ক এবং ড্রিবলিং ছিল অতুলনীয়।

ওদিকে পাকিস্তানও হাসান সরদার নামক 'ভয়ঙ্কর' ফরোয়ার্ডটিকে

হাসান সরদার

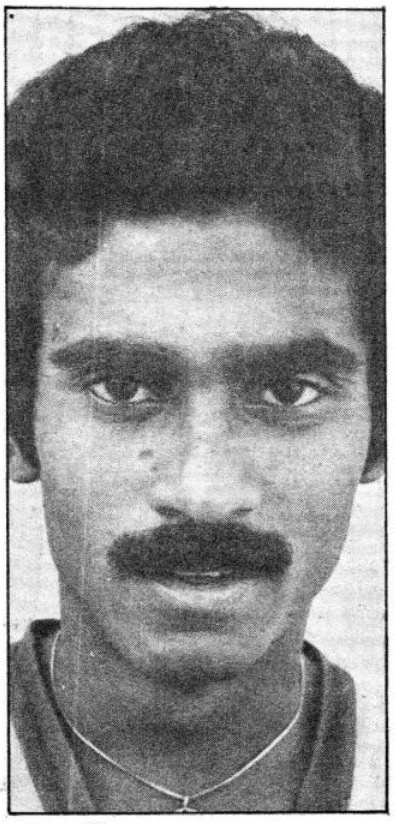

মহম্মদ শাহিদ

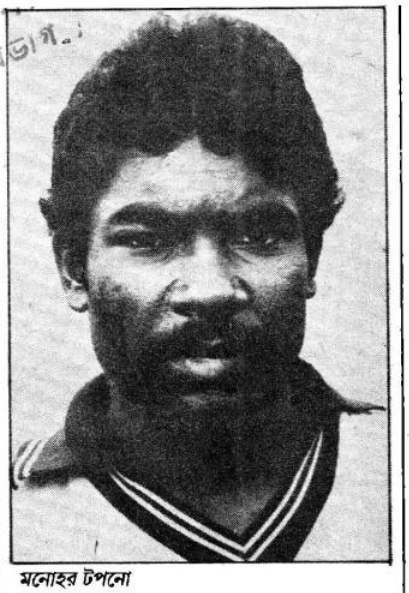

মনোহর টপনো

আক্রমণের সামনে রেখে টুক্টুক্ করে এগিয়ে যাচ্ছিল প্রতিপক্ষ দেশগুলির বাধা কাটিয়ে। শুরুতেই ইরানকে ষোলো গোল দিয়ে পাক-ফরোয়ার্ডরা আগাম ওয়ার্নিং দিয়ে রাখে ভারতকে। চারটি খেলায় তারাও গোল করে একুশটি। সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে সাত গোলে চূর্ণ করে পাকিস্তান ফাইনালে মুখোমুখি হয় ভারতের।

ফাইনালে ভারতই ছিল ফেবারিট। যদিও প্রথম গোলটি করে পাকিস্তানকে এগিয়ে দেন হানিফ খান। খেলার বয়স তখন মাত্র বত্রিশ মিনিট। গোলের খোঁচা খেয়ে ভারত ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং গুনে গুনে সতেরোটি পেনাল্টি কর্নার অপচয় করার পরে দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে সমতা আনে নঈমের গোলে। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে পাকিস্তানকে আবার এগিয়ে দেন মুস্তাক আমেদ। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভারতের পক্ষে গোল শোধ করেন হরদীপ। খেলার শেষ বাঁশি বাজার ঠিক মিনিট চারেক আগে ভারতের গোলমুখে জটলার মধ্যে থেকে প্রায় কাঁধসমান উঁচু একটি বলে হিট্ নিয়ে পাকিস্তানের কলিমুল্লা বল ঢুকিয়ে দেন নেটে। জাপানি আম্পায়ারের দেওয়া গোলের বিস্ময়কর নির্দেশে ভারত প্রতিবাদ জানিয়েও ফল পায়নি। খেলা বন্ধ থাকে প্রায় বত্রিশ মিনিট। শেষ পর্যন্ত ভারত মাঠে ফিরলেও খেলার ভাগ্য ফেরাতে পারেনি।

ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমকটিকে !
सुपर
रिन
সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক...
অন্য যে কোনো ডিটারজেণ্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী।
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

দার্জিলিং আর পাহাড়তলির বাছাই করা ফল থেকে–জিভে জল আসা জ্যাম, জেলী, মার্মালেড, স্কোয়াশ, সস্, টিনেভর্ত্তি জুস্, আনারসের মিষ্টি চাকা আর টিট্‌বিট্‌স্।

Kanchan

Darjeeling Fruit & Vegetable Processing Co-operative Society Ltd.

Mileage/K-2